গল্পস্বল্প।

শ্রীস্বর্ণকুমারী দেবী

প্রণীত।

তৃতীয় সংস্করণ।

কলিকাতা,

বহুবাজার, শ্রীনাথ দাসের লেন্, ১৭ নং ভবনে,

বি, কে, দাস এবং কোম্পানীর যন্ত্রে,

শ্রীঅমৃতলাল ঘোষ দ্বারা মুদ্রিত।

১২৯৮।

General merchants,
B. K. D. & Co.
Commission agents.

উপহার

ভাই বোনকে

শুধু এই হাসি খুসি,
শুধু ছেলেখেলা—
কাটি দিবে জীবনের
সুদীর্ঘ এ বেলা ?

শুধু এই হাহাকার,
শুধু অশ্রু-ব্যথা—
হৃদয়ের আঁখি-পাতে
রহিবে কি গাঁথা ?

কিছুই নাহি কি আর
প্রাণ যাহা যাচে ?—
থাকুক তোদের তাহা
ভাব্যাণের কাছে।

সূচীপত্র।

গল্পসল্প।

মনুষ্য জীবনের উদ্দেশ্য।

আমরা সকলেই জানি মনুষ্য পশু হইতে শ্রেষ্ঠ; কিন্তু ভাবিয়া দেখ—কিসে? পশুরও শরীর আছে, মানুষেরও শরীর আছে; মানুষের আকার পশু হইতে ভিন্ন বটে, কিন্তু আকারের প্রভেদেই যে কেহ শ্রেষ্ঠ হয় তাহা নহে। পশু-দিগেরও সকলের ভিন্ন ভিন্ন আকার। মানুষের ন্যায় পশুদিগেরও ক্ষুধা, তৃষ্ণা, ক্রোধ, দ্বেষ, স্নেহ, ভালবাসা আছে, এমন কি জন্তুদিগের মধ্যে বুদ্ধিরও পরিচয় পাওয়া যায়। তবে মানুষকে পশু অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বলা যায় কেন? মানুষের এমন কতকগুলি গুণ আছে, যাহা পশুতে পাওয়া যায় না—সেই গুণেই মানুষ বড়। পশুর যদিও বুদ্ধি আছে, কিন্তু মানুষের ন্যায় উচ্চ বুদ্ধি নাই, চিন্তা-শক্তি নাই, মানুষের মত ধর্ম্ম-ভাব নাই। চিন্তা বলে, বুদ্ধি বলে, মানুষ ভাল হইতে মন্দের প্রভেদ বুঝিতেছে, কল কৌশল উদ্ভাবন করিতেছে, পৃথিবীতে বসিয়া সূর্য্যের সংবাদ আনিতেছে। ধর্ম্মের ভাব আছে বলিয়া মানুষ ঈশ্বরানুরাগী হইতেছে, কুপ্রবৃত্তি দমন করিতেছে এবং

সমস্ত জগৎবাসীকে সেই এক জগৎপিতার সন্তান জ্ঞানে পরোপকারে রত হইতেছে, অন্যের মঙ্গলে নিজের মঙ্গল জ্ঞান করিয়া নিস্বার্থতার কাছে স্বার্থ জলাঞ্জলি দিতেছে। এই সকল গুণের জন্যই মানুষ পশু হইতে শ্রেষ্ঠ। কিন্তু যাহার এ সকল গুণ বিকশিত হয় নাই, যে অজ্ঞান, যাহার ধর্ম্মভাব নাই, পশুর সহিত তাহার বিশেষ প্রভেদ নাই। সুতরাং কেবল মানুষের শরীর হইলেই মানুষ হওয়া যায় না; জ্ঞান ধর্ম্মে যে উন্নতি লাভ করিয়াছে, সেই প্রকৃত মনুষ্য। আহার বিহার করিয়া পশুর মত জীবন ধারণ করাই মনুষ্য জীবনের উদ্দেশ্য নহে, মনুষ্যত্ব লাভ করিতে চেষ্টা করাই মনুষ্য জীবনের উদ্দেশ্য।

তুমি যদি মনুষ্য হইতে চাও, ত জ্ঞানের অনুশীলন কর; ক্ষমা, করুণা, সত্যানুরাগ প্রভৃতি মনুষ্যের অন্তর্নিহিত সদ্গুণ সকলের বিকাশ ও ক্রোধ, দ্বেষ, লোভ প্রভৃতি পাশব প্রবৃত্তি সকলের ন্যায্য দমন দ্বারা যথার্থ মনুষ্য হও। ঈশ্বর, যিনি আমাদের পিতা মাতা সৃষ্টিকর্ত্তা, ইহাই তাঁহার আদেশ, ইহাই তাঁহার প্রিয় কার্য্য। আমাদের মঙ্গলের জন্যই তিনি আমাদিগকে তাঁহার এই আজ্ঞা পালন করিতে বলেন। তাঁহার এই আজ্ঞার নামই ধর্ম্মনীতি। এই নীতি যাঁহারা পালন করিয়া চলেন, তাঁহারাই যথার্থ বড় লোক, তাঁহারাই মহাত্মা; আর যাহারা ইহা অমান্য করিয়া চলে, তাহারা মনুষ্য নামের অযোগ্য।

অন্যায় কর্ম্ম করিতে যাহার সঙ্কোচ নাই, সহস্র বার ঈশ্বরের নাম গ্রহণ করিলেও সে ঈশ্বরানুরাগী নহে। যে ঈশ্বরের প্রিয় কার্য্য সাধন করে, সেই যথার্থ সাধক। ঈশ্বর তোমাকে মানুষ করিয়া গড়িয়াছেন, তাঁহার প্রিয় কার্য্য সাধন করিয়া অর্থাৎ শুভ কার্য্যের অনুষ্ঠান এবং অন্যায়াচরণ পরিত্যাগ পূর্ব্বক তাঁহার প্রতি অনুরাগী হইয়া, তোমার জীবনের উদ্দেশ্য সফল কর। ইহাতেই তুমি যথার্থ সুখ শান্তি লাভ করিবে।

মাতার আশীর্ব্বাদ।

বাছা,

ও ঠোঁটের পুণ্য হাসি যেন চির ফুটে,
ও মুখের সরলতা যেন নাহি টুটে।
ও প্রাণের পবিত্রতা শুভ্র নিরমল,
করে যেন ব্যথিতের হৃদয় উজ্জ্বল।
অশ্রুজল বহে যদি, বহে যেন তবে—
সান্ত্বনা দিবার তরে দীন হীন সবে।
প্রাণের বাসনা ইহা—শুধু কথা নয়,
মঙ্গল আশীষ এই শুভ আলোময়।
ভুলে যদি যেতে চাও ভুলো কথা গুলি,
ভোল যদি কে বলেছে, তাও যেয়ো ভুলি।
এ আলোক শুধু যেন আঁখি পথে থাকে,
পাপ তাপ হতে তোমা দূরে দূরে রাখে।

———:•:———

শুভ কাজের সুযোগ হারাইও না।

"যানি অনবদ্যানি অনিন্দিতানি কর্ম্মাণি তানি সেবিতব্যানি ত্বয়া। নো ইতরাণি নিন্দিতানি কর্ত্তব্যানি।"

কল্যাণকর যে সকল কর্ম্ম তাহার অনুষ্ঠান করিবেক, অকল্যাণকর কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিবেক না।

আজ রমেশের ছুটি। ছুটি পাইয়া রমেশের বড়ই আনন্দ হইয়াছে। সারাদিন কত রকম খেলা করিবে—তাহাই ভাবিতেছে, এমন সময় রমেশের মা বলিলেন—"রমেশ, আজ ত সমস্ত দিন তোমার কোন কাজ নাই, আমার ঘরে বইগুলি বড় বিশৃঙ্খল হইয়া আছে, যদি তুমি সেইগুলি গুছাইয়া ঘরটি পরিষ্কার কর, তবে আমার কাজের একটু সুবিধা হয়।"

এই কথা শুনিয়া রমেশ বড়ই বিরক্ত হইল। "তাই ত! খেলা ধূলা ছাড়িয়া আমি এখন মায়ের কাজ করিতে যাই!"

রমেশ মায়ের কথা না শুনিয়া খেলা করিতে চলিয়া গেল। খানিক দূর গিয়া বসুদের পুকুর ধারে সুষমাকে দেখিতে পাইল; সুষমাকে তাহার নিতান্ত বিষণ্ণ বলিয়া মনে হইল। সুষমা রমেশের পিতৃব্য-কন্যা, তাহাকে রমেশ বড় ভালবাসে, সুতরাং তাহাকে বিষণ্ণ দেখিয়া নিকটে আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল—"সুষমা, কি হইয়াছে? অমন চুপ করিয়া বসিয়া আছিস যে?"

বালিকা বিষণ্ণভাবে বলিল—"আমার একটি জিনিস হারাইয়া গিয়াছে।"

রমেশ। কি জিনিস বলনা, আমি খুঁজিয়া দিই।

সু। মা বলিয়াছেন সে জিনিস একবার হারাইলে আর খুঁজিয়া পাওয়া যায় না, তাহার প্রতি সর্ব্বদাই নজর রাখিতে হয়।

উভয়ের এইরূপ কথাবার্ত্তা হইতেছে এমন সময় সুরেন্দ্র আসিয়া বলিল—"কি রমেশ কি কথা হইতেছে?"

রমেশ সে কথায় কর্ণপাত না করিয়া একটু বিরক্তির ভাবে বালিকাকে বলিল—"তুমি হাজার কথা না কহিয়া কি শুধু জিনিসের নামটি বলিতে পার না?"

বালিকা একটু থতমত খাইয়া বলিল "আমি সুযোগ হারাইয়াছি।"

সুরেন্দ্র এই কথা শুনিয়া হাসিয়া বলিল—"হা হা হা—বাস্তবিক সুযোগ হারান বড় কষ্ট। আমি কিন্তু সে বিষয়ে বড়ই সাবধান। আজ সকালে আমার পড়া হয় নাই বলিয়া দুপঃ বেলা বাবা আমাকে পড়িতে বলিলেন. যতক্ষণ বাবা বাড়ীতে ছিলেন ততক্ষণ কাজেকাজেই পড়িতে হইল, কিন্তু যেই বাবা বাহিরে গিয়াছেন, অমনি আমি পলাইয়া আসিয়াছি—এমন সুযোগ আমি হারাই!"

সুষমা বলিল—"এ বুঝি সুযোগ! মন্দ কাজ করিতে যে সময় পাওয়া যায়, মা তাহাকে কুযোগ বলেন,—সে ত হারানই

ভাল। তুমি যে তোমার বাবার কথা শুনিলে না—তুমিও ত একটি সুযোগ হারাইলে—তবে আবার অত জাঁক কি জন্য ?"

সুষমার কথা রমেশেরও বড় ভাল লাগিল না—কারণ সেও ত মায়ের কথা শোনে নাই—বলিল "ও কথা যাক,—তুমি কিসের সুযোগ হারাইলে ?"

বালিকা বলিল—"আমি যে দিন দিদিমার বাড়ী গিয়াছিলাম, সেদিন দিদিমা আমাকে একটি সিকি দিয়াছিলেন। মা সিকিটি দেখিয়া বলিলেন—'আরে সুষি, তুই সিকি পেয়েছিস, বেশ হয়েছে! এতে কত কাজ হয়, কত গরীব দুঃখীকে দান করা যায়, এমন সুযোগ যেন হারাস নে'—কিন্তু খানিক বাদেই আমি সেই সিকিটি দিয়া একটি পুতুল কিনিয়া ফেলিলাম। আজ এখনি একজন ভিক্ষুক আমার কাছে ভিক্ষা চাহিতে আসিয়াছিল—আহা বেচারা সমস্ত দিন কিছুই খায় নাই—আমি যদি সিকিটি তাহাকে দিতে পারিতাম ত তাহার কত খাবার হইত! আমি কিন্তু সে সুযোগটি হারাইয়াছি।"

এই বলিয়া বালিকা কাঁদ কাঁদ হইল, রমেশ আর থাকিতে পারিল না, অনুতপ্ত হৃদয়ে বলিল "সুষমা আমিও আজ একটি সুযোগ হারাইয়াছি—আমি আজ মায়ের কাজ করিতে পারিতাম—তাহা করি নাই।"

সুষমা বলিল—"তবে দেখিতেছি আমরা দুজনেই সুযোগ হারাইয়াছি—কেবল সুরেন্দ্রই লাভ করিয়াছে!"

এই কথা শুনিয়া সুরেন্দ্র একটু লজ্জিত হইয়া বলিল—"সুষমা,

আমাকে ক্ষমা কর—এখন আমি বুঝিতেছি আমিও সুযোগ হারাইয়াছি। আমি পিতাকে সন্তুষ্ট করিতে পারিতাম তাহা করি নাই, নিজের বিদ্যাশিক্ষায় সময় দিতে পারিতাম তাহা দিই নাই, আমি তোমাদের সকলের অপেক্ষা অধিক হারাইয়াছি।"

সুরেন্দ্র অনুতপ্ত হইয়া ভবিষ্যতে সুযোগের সদ্ব্যবহার করিবে বলিয়া সঙ্কল্প করিল। সুষমা নিজে সুযোগ হারাইয়া এতক্ষণ যদিও বিষণ্ণ হইয়া পড়িয়াছিল—কিন্তু অন্য দুই জনকে তাহার কথায় জ্ঞানলাভ করিতে দেখিয়া তাহারও সে কষ্ট অধিকক্ষণ রহিল না।

প্রভাত।

অরুণ-মুকুট শিরে, অধরে উষার হাসি,
পদতলে প্রস্ফুটিত শত শত ফুল রাশি!
শুভ্র পরিমল-বাসে উথলিত তনুখানি,
ধরায় চরণদান করিছে প্রভাত রাণী!
আনন্দের কোলাহলে চারিদিক নিমগন,
পাখী গায় আগমনী হাসে বন উপবন।
কম্পিত সরসী হিয়া মৃদু ঝুরু ঝুরু বায়,
কমল কোমল-আঁখি সুধীরে খুলিয়া চায়।
উপকূলে থরে থরে বায়ুভরে দুলি দুলি,
হরষে সরসে মুখ দেখিতেছে তরুগুলি।
এসেছে তুলিতে ফুল বালিকা সাজিটি হাতে,
ভুলে গেছে ফুল তোলা চেয়ে আছে নভ-পাতে।
শুভ্র অভ্র জ্যোতির্ম্ময় অরুণ কিরণ মাখা,
গাহিয়া উড়িছে পাখী বিছায়ে পেলব পাখা।
বালিকা দেখিছে চেয়ে, ফুল তোলা গেছে ভুলে,
প্রতিধ্বনি গাহিতেছে সপ্তমে লহরী তুলে।
কোমল অমৃত স্বরে বিভু নামে উঠে তান!
প্রভাত আনন্দ-মগ্ন সে গীত করিয়ে পান!

সুবুদ্ধির উপদেশ।

যস্তু নিঃশ্রেয়সং বাক্যং মোহান্ন প্রতিপদ্যতে।
স দীর্ঘসূত্রোহীনার্থঃপশ্চাত্তাপেন যুজ্যতে॥

যে ব্যক্তি মোহ-হেতু হিতবাক্য গ্রহণ না করে, সে দীর্ঘসূত্রী হইয়া মনুষ্যত্ব হইতে ভ্রষ্ট হয় এবং পশ্চাৎ সন্তাপে পতিত হয়।

মনুষ্যের দুইরূপ বুদ্ধি আছে—সুবুদ্ধি ও কুবুদ্ধি। যে বুদ্ধি আমাদিগকে শুভ কর্ম্মে উত্তেজিত করে ও অন্যায় কর্ম্ম হইতে বিরত রাখে তাহাই সুবুদ্ধি, আর যে বুদ্ধির দ্বারা আমরা অন্যায় কাজ করি তাহাই কুবুদ্ধি। কুবুদ্ধির পরামর্শ শুনিয়া চলিলে তুমি পশুর মত হইয়া পড়িবে, সুবুদ্ধির পরামর্শ শুনিলে তোমার ধর্ম্ম-ভাব ফুটিয়া উঠিবে—তুমি মনুষ্যত্ব লাভ করিবে। সুতরাং সাবধানে কুবুদ্ধিকে পরিত্যাগ করিয়া সুবুদ্ধির অনুসরণ কর।

একটি সুন্দর বাগানে লাবণ্য বসিয়া আছে, চারিদিকে কত রকম ফুল ফুটিয়াছে, কত ফোয়ারা ছুটিতেছে, কত রূপ পাথরের পুতুল সাজান রহিয়াছে, কিন্তু লাবণ্যের সে সব কোন দিকেই মন নাই, তাহার হাতের একটি পুতুল লইয়াই সে ব্যস্ত। সে কখনো তাহাকে কাপড় পরাইতেছে, কখনো আদর করিতেছে, কখনো তাহার সহিত কথা কহিতেছে, এমন সময় হঠাৎ যেন আকাশের একটা দিক অত্যন্ত লাল হইয়া উঠিল, লাবণ্য আশ্চর্য্য

হইয়া সেই দিকে চাহিয়া দেখিল, অমনি সেই লাল মেঘের মধ্য হইতে একটি পরী নামিয়া আসিয়া যেন তাহার কাছে দাঁড়াইলেন—লাবণ্য আরো আশ্চর্য্য হইয়া এক দৃষ্টে পরীর মুখের প্রতি চাহিয়া রহিল। ক্রমে তাহার চক্ষে আর সকলি মিলাইয়া যাইতে লাগিল—গাছ, পাতা, ফুল, ফোয়ারা সকলি মিলাইয়া গেল, পৃথিবী আকাশ সমস্ত সরিয়া পড়িল—কেবল সেই পরীর প্রতিমাখানি ভিন্ন আর সে কিছুই দেখিতে পাইল না। কিন্তু এ আবার কি! ক্রমে সে ছবিখানিও অদৃশ্য হইয়া পড়িল। তখন তাহার আবার চমক ভাঙ্গিল, সবিস্ময়ে সে চারিদিকে চাহিয়া দেখিল, সে পরী নাই, সে বাগান নাই—সে কিছুই আর নাই, তাহা অপেক্ষা উৎকৃষ্টতর আর একটি বাগানে সে একাকী আসিয়া পড়িয়াছে। কি চমৎকার বাগান! এমন বাগান সে জন্মে কখনো দেখে নাই। এ কি নন্দন কানন? দিদিমার কাছে লাবণ্য স্বর্গের যে নন্দন কাননের গল্প শুনিয়াছে, এ কি সেই কানন! বাগান আলো করিয়া গাছে গাছে কি সুন্দর ফুল ফুটিয়া আছে? ও গুলি কি পারিজাত? অমন ফুল ত লাবণ্য জীবনে কোথাও দেখে নাই, কি সুন্দর! কি সুবাস! সরোবরের ধারে ও আবার কিরূপ বন? ও যে ফুলের বন! ফুলে ফুলে দলে দলে ঘেঁসাঘেসি করিয়া মিলিয়া মিশিয়া এক হইয়া রহিয়াছে! এত ফুল ওখানে কে ফুটাইল? সরোবরের পদ্মপত্রে ঐ রাঙ্গা পাখীগুলি—কি পাখী? ময়ূর না হাঁস? না উহারা ময়ূরও

নহে—হাঁসও নহে, উহারা যে গান করিতেছে! কি মধুর সঙ্গীত!—এ কাননের কোকিল এমন সুন্দর দেখিতে? তাহারা পদ্ম-পত্রে ভাসিয়া গান গাহিয়া বেড়ায়! লাবণ্য উল্লাসে উৎফুল্ল হইয়া পুতুলটিকে বক্ষে লইয়া বাগানে ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিল, বেড়াইতে বেড়াইতে দেখিল—বাগানের নানা প্রকার সুগন্ধ সুদৃশ্য অপরিচিত পুষ্পবৃক্ষের এক পাশে একটি গোলাপের গাছ, সেই গাছে একটি সুন্দর গোলাপ। লাবণ্য সেই গোলাপটি তুলিতে হাত বাড়াইল, এমন সময় সহসা কোথা হইতে সেই পরী আসিয়া বলিলেন—"ইহা তুলিও না, ঐ দেখ কত ধৈর্য্য-ফুল ফুটিয়া রহিয়াছে! উহার একটি তোল, গোলাপ অপেক্ষা দেখ ঐ ফুলগুলি কত সুন্দর! গোলাপ ত তোমাদের বাগানে অনেক আছে, ঐ ধৈর্য্য-ফুল একটি তুলিয়া লইয়া যাও, উহা মর্ত্ত্যলোকে পাইবে না, ও ফুল তোমাদের বাগানে রাখিলে বাগান শোভা করিয়া চিরদিন নবীন ভাবে ফুটিয়া থাকিবে। উহা নন্দন কাননের ফুল, পৃথিবীর ফুলের মত উহা শুকাইয়া যায় না। আর ঐ গোলাপের গাছ পৃথিবী হইতে আনিয়া এ কাননে রোপণ করা হইয়াছে,—ইহা তুলিও না তুলিতে শুকাইবে।"

কিন্তু লাবণ্য তখন গোলাপ তুলিতে হাত বাড়াইয়াছে—হাতের ফুল ফেলিয়া কে আবার তখন দূরে যায়, সে বলিল—"অত দূরে আমি আর যাইতে পারি না" বলিয়া তাড়াতাড়ি গোলাপটি ছিঁড়িয়া লইল—তাড়াতাড়িতে গোলাপের কাঁটা

বিঁধিয়া তাহার হাত হইতে বিন্দু বিন্দু রক্ত পড়িতে লাগিল, তখন সে গোলাপটি ফেলিয়া দিয়া কাঁদিতে আরম্ভ করিল। পরী বলিলেন "দেখ আমার কথা শুনিলে তোমার এই কষ্ট পাইতে হইত না—ঐ যে ধৈর্য্য-ফুল দেখিতেছ, উহার কাঁটা নাই। ভাল কথা না শুনিয়া কাজ করিলে দেখ কিরূপ বিপদে পড়িতে হয়"—

পরীর এই উপদেশে লাবণ্য আরো রাগিয়া গেল, সে কাহারও উপদেশ শুনিতে ভালবাসিত না, সে রাগ করিয়া সেখান হইতে চলিয়া গেল। কিছু দূর গিয়া একবার যখন ফিরিয়া চাহিল, দেখিল—পূর্ব্বের বাগানের আর চিহ্নও নাই, কতদূরে তাহা সে ফেলিয়া আসিয়াছে। তাহার বড় কষ্ট হইল। এই সময় সে নিকট দিয়া একটি বালককে যাইতে দেখিয়া বলিল "ভাই, আমি এতক্ষণ বড় একটি সুন্দর বাগানে খেলা করিতে-ছিলাম—রাগ করিয়া চলিয়া আসিয়া ভাল করি নাই, আমাকে পথ দেখাইয়া সেখানে লইয়া যাইতে পার?"

বালক বলিল "ভাই আমাদের এখানে ত কোন বাগান নাই—কোথায় লইয়া যাইব?" বালিকা আবার রাগ করিয়া বলিল "নাই বই কি? আমি এইমাত্র সেখান হইতে আসি-তেছি। সেখানে ফুল তুলিতে গিয়া এই দেখ আমার হাতে কাঁটা বিঁধিয়া গিয়াছে—"

বালক বলিল—"পরী তোমাকে এত বারণ করিলেন, তবুও তুমি কেন ফুল তুলিতে গেলে? তিনি ত তোমার ভালর জন্যই

বারণ করিয়াছিলেন, তাহা ত শুনিলেই না—আবার রাগ করিয়া চলিয়া আসিলে—এজন্য তোমার নিতান্ত লজ্জা পাওয়া উচিত।"

লজ্জিত হইবার পরিবর্ত্তে লাবণ্য তাহার কথায় বিরক্ত হইয়া সেখান হইতে চলিয়া গেল। পথে তাহার আর একটি বালিকার সহিত সাক্ষাৎ হইল—বালিকা তাহার হাতের পুতুলটি দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিল—"ভাই তোমার হাতে ওটি কি?"

লাবণ্য বলিল—"আমার পুতুল।"

বা। "ওটি আমাকে দিবে?"

লা। 'না'

বালিকা বলিল—"না বই কি" বলিয়া জোর করিয়া লাবণ্যের হাত হইতে পুতুলটি সে কাড়িয়া লইল, লাবণ্য তাহার সহিত জোরে পারিল না। পুতুলটি হারাইয়া তাহার বড় কষ্ট হইল—সে কাঁদিয়া ফেলিল। তাহার চক্ষু দিয়া জল পড়িবামাত্র অমনি তাহার একটি ঘটনা মনে পড়িয়া গেল, এতক্ষণ সেকথা এক মুহূর্ত্তের জন্যও তাহার মনে হয় নাই। তাহার মনে পড়িল—পুতুলটি তাহার নহে, তাহার ছোট বোন মালতীর। মালতীর প্রথম ভাগ পড়া শেষ হওয়ায় মা আহ্লাদ করিয়া এই পুতুলটি আজ সকালে তাহাকে পুরস্কার দিয়াছেন। লাবণ্য তাহা দেখিয়া মায়ের কাছে তখনি পুতুল চাহে—মা বলেন—"বাছা তোমাকেও ত আমি তোমার প্রথম ভাগ শেষ হইলে এইরূপ একটি পুতুল দিয়াছি। আবার দ্বিতীয় ভাগ শেষ হইলে আর একটি দিব, তুমি যত্ন করিয়া বইখানি শেষ কর দেখি"—

দ্বিতীয় ভাগ শেষ করা পর্য্যন্ত অতদিন ধৈর্য্য সহকারে পুতুলের জন্য অপেক্ষা করা লাবণ্যের কাজ নহে, সে সেই দিনই জোর করিয়া মালতীর পুতুলটি কাড়িয়া লইল। বেচারা মালতী তাহার সহিত পারিল না, কাঁদিয়া নিরস্ত হইল। লাবণ্য আরও বলিল—“যদি মাকে এ কথা বলিস্ ত তোকে মারিব।” ভয়ে ভয়ে সে তাহা মাকেও বলিল না।

সকালের এই কথা এখন তাহার সমস্ত মনে পড়িয়া গেল—পুতুল কাড়িয়া লওয়ায় মালতীর কত কষ্ট হইয়াছিল, লাবণ্য তাহা এখন বুঝিতে পারিল, তাহার বড়ই অনুতাপ হইতে লাগিল, পুতুলটি বোনকে ফিরাইয়া দিবার জন্য সে ব্যগ্র হইয়া উঠিল—কিন্তু পুতুলটি এখন সে কোথায় পাইবে—তাহা আর এখন তাহার নহে, আর এক জন কাড়িয়া লইয়াছে। এই সময় সেই পরী পুতুলটি হাতে করিয়া তাহার নিকট আসিয়া দাঁড়াইলেন। লাবণ্য তখন কাঁদিতে কাঁদিতে পরীর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিয়া বোনকে পুতুলটি ফিরাইয়া দিবার ইচ্ছায় তাঁহার নিকট হইতে তাহা চাহিয়া লইল।

পুতুলটি হাতে পাইবামাত্র তাহার ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল, দেখিল কোথায় বা পরী—কোথায় বা বাগান, পুতুলটিকে কোলে করিয়া যেখানে সে শুইয়া পড়িয়াছিল—সেই খানেই শুইয়া আছে!

লাবণ্য জাগিয়া তাড়াতাড়ি উঠিল, উঠিয়া পুতুলটি লইয়া তখনি মালতীকে ফিরাইয়া দিল, এবং সেই পর্য্যন্ত আর

সে কখনও ভাই বোনকে কাঁদাইয়া তাহাদের কোন খেলেনা পত্র লইত না, ধৈর্য্য সহকারে ভাল সময়ের জন্য অপেক্ষা করিয়া থাকিত।

——:o:——

আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি, যে বুদ্ধি আমাদিগকে শুভ কর্ম্মে চালিত ও অন্যায় কর্ম্ম হইতে বিরত করে, তাহাই সুবুদ্ধি।

লাবণ্যের সুবুদ্ধির উদ্রেক হওয়াতেই সে এইরূপ স্বপ্ন দেখিয়াছিল, এবং এই বুদ্ধির অনুসরণ করিয়াই লাবণ্য পরে ভাল হইল। লাবণ্যের মত সকলেরই সুবুদ্ধির অনুসরণ করিয়া চলা কর্ত্তব্য।

——:o:——

শান্তি নিকেতন।

সঙ্গীত।

কি সুন্দর নিকেতন,
নেহারিয়া পূর্ণ মন
স্বত উচ্ছ্বসিয়া উঠে,
তোমা পানে, জগত-জীবন।
তোমারি মঙ্গল গাথা,
গাহিছে প্রকৃতি হেথা,
তোমারি মঙ্গল ভাব,
পাতিয়াছে হেথায় আসন।
তোমার শান্তির হাস,
চারিদিকে পরকাশ,
তাহারি বিমল ছায়ে
ঘুমাইছে স্নিগ্ধ উপবন।
যে দিকে ফিরাই আঁখি,
শান্তির সুষমা দেখি,
তোমার স্নেহের ভাবে,
অভিভূত হৃদি প্রাণ মন।
হেথায় প্রভেদ নাই,
নভঃ পৃথী এক ঠাঁই

তব প্রেমামৃত পিয়ে,
আনন্দে করিছে আলিঙ্গন।
সে প্রেম উছলি আসি,
হৃদয়-মন্দিরে পশি
সঞ্চরে তাপিত প্রাণে,
প্রভু ওহে নূতন জীবন।
সুরভি লহরী তুলি,
বিজনে পরাণ খুলি
তোমারি মহিমা গায়,
দিবস রজনী সমীরণ।
চারিদিকে তরুলতা,
হরষে নোয়ায়ে মাথা
সমভাবে এক মনে,
ধ্যেয়াইছে তোমারি চরণ।
এমনি এ পুণ্য স্থান,
সংস্রবে পবিত্র প্রাণ,
পৃথিবীর দুঃখ জ্বালা
করে ভয়ে দূরে পলায়ন—
পিতা গো আজিকে তাই,
এসেছি এ পুণ্য ঠাঁই,
জুড়াও তাপিত হৃদি
করি শান্তি সুধা বরিষণ।

বীরেন্দ্রসিংহের রত্ন লাভ।

সত্যমেব ব্রতং যস্য দয়াদীনেষু সর্ব্বদা,
কামক্রোধৌ বশে যস্য তেন লোকত্রয়ং জিতম্।

সত্যই যাঁহার ব্রত, সর্ব্বদা দীনে যাঁহার দয়া, কাম ক্রোধ যাঁহার বশীভূত, লোকত্রয় জয় করিতে তিনিই সমর্থ।

—————•:—————

সংসারে ধন একটি প্রধান প্রয়োজনীয় বস্তু। কেননা ধনে আমাদের অনেক অভাব মোচন হয়, ধন ব্যবহার করিতে জানিলে ইহা দ্বারা জগতের অনেক উপকার সাধিত হয়, সুতরাং সকলেরই ন্যায়পথে থাকিয়া ধন উপার্জ্জনে যত্নবান হওয়া উচিত। কিন্তু তাই বলিয়া যিনি মনে করেন ধনেই বড় লোক হওয়া যায়—তিনি বড় ভুল বুঝেন। দেখ রাবণ কত বড় ধনী ছিলেন। তাঁহার লঙ্কাপুরী স্বর্ণময়ী—দেবতাগণ তাঁহার দাসত্ব করিতেন, কিন্তু তাঁহাকে ত কেহ বড় লোক মনে করে না। কেন করে না? আমরা ত পূর্ব্বেই বলিয়াছি অন্যায় কর্ম্মের পরিত্যাগেই লোকে যথার্থ বড় লোক হয়, অন্যায় কর্ম্ম করিয়া কেহ বড় লোক হয় না। রাবণ অধর্ম্মাচারী ছিলেন, সেইজন্য অতুল ঐশ্বর্য্য ও ক্ষমতার অধিকারী হইয়াও তিনি বড় লোক নহেন। এ কথা কিন্তু সকলে বোঝে না; মনে করে ধনবান ক্ষমতাবান হইলেই বড় লোক হওয়া যায়। পুরাকালে দাক্ষিণাত্যের এক রাজসভায়

বীরেন্দ্রসিংহ নামে এক রাজমন্ত্রী ছিলেন। তিনিও ইহা বুঝিতেন না। তাঁহার বড় লোক হইবার বড় সাধ ছিল, তিনি মনে করিতেন রাজ ক্ষমতা, রাজধন পাইলেই তিনি বড় লোক হইবেন। এই লোভের বশবর্ত্তী হইয়া তিনি অন্যায় পূর্ব্বক তাঁহার প্রভুর সিংহাসন অধিকার করিয়া স্বয়ং রাজা হইলেন।

বীরেন্দ্র সিংহ বড় মৃগয়াপ্রিয় ছিলেন। এক দিন তিনি সৈন্য ও সভাসদের সহিত মৃগয়ায় গমন করিলেন,—সহস্র সহস্র অশ্ব পদদর্পে প্রান্তরপথ কম্পিত করিয়া মৃগয়াক্ষেত্রে আসিয়া উপনীত হইলেন। ক্ষেত্রের প্রান্তসীমা হইতে একটী হরিণ শাবক, ভয়বিহ্বল-নেত্রে অশ্বারোহীদিগের প্রতি একবার চাহিয়া সহসা দ্রুতবেগে পলায়ন করিল, মহারাজ সঙ্গিবর্গকে পশ্চাতে ফেলিয়া তাহার অনুসরণ করিলেন।

বেলা দ্বিপ্রহর হইয়াছে, সূর্য্যের প্রখর কিরণে চারিদিক ঝাঁ ঝাঁ করিতেছে, উত্তপ্ত বায়ু-স্রোতে উত্তপ্ত ধূলিকণার তরঙ্গ উঠিতেছে, চারিদিক নিস্তব্ধ,—দিগন্ত-শূন্য বিশাল প্রান্তরে মৃগশিশুটি বিদ্যুতের মত এক একবার মহারাজকে দেখা দিয়া মাঝে মাঝে উন্নত অসম ভূমি, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ঝোপঝাপ ও শুষ্ক তৃণ-স্তূপের অন্তরালে আবার অদৃশ্য হইয়া পড়িতেছে। আর লোক নাই, আর পশু নাই—অগ্নিময় প্রান্তর যেন জীব-শূন্য। অতিরিক্ত পরিশ্রমে মহারাজের শরীর শ্রান্ত ক্লান্ত, মৃগয়ার উৎসাহে তথাপি তিনি শ্রান্তি অনুভব করিতেছেন না, অবিশ্রান্ত অনাবৃত বেগে মৃগের অনুসরণ করিতেছেন। দেখিতে দেখিতে

মৃগশিশুটী প্রান্তর ছাড়াইল, তিনিও প্রান্তর ছাড়াইলেন, মৃগ এক অনিবিড় বন মধ্যে প্রবেশ করিল, তিনিও প্রবেশ করিলেন। বন মধ্যে একটী মন্দির, তথায় মৃগশিশু প্রাণপণ গতিতে আশ্রয় গ্রহণ করিল,—রাজা হতাশ হইয়া মন্দিরের দ্বারে আসিয়া দাঁড়াইলেন, বুঝিলেন তাহা মন্দিরের প্রতিপালিত মৃগ—সুতরাং অবধ্য।

নিরাশ অবসন্ন রাজা শ্রান্তি দূর করিবার নিমিত্ত মন্দিরে আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। পুরোহিতের আতিথ্য-সৎকারে গতশ্রম হইয়া কিয়ৎক্ষণ পরে তিনি দেব চরণে প্রণাম করিতে গমন করিলেন। অপরাহ্নের নিস্তেজ সূর্য্যরশ্মি মন্দির ভেদ করিয়া শিবমূর্ত্তি উজ্জ্বল করিতে অক্ষম,—শিবের গাত্রজড়িত একটী সর্পের মস্তকস্থিত জ্বলন্ত দীপালোকে তাঁহার মূর্ত্তি বিভাসিত দেখিলেন। প্রণাম করিয়া উঠিবার সময় মহারাজের দৃষ্টি প্রদীপে আকৃষ্ট হইল—কি আশ্চর্য্য! দেখিলেন প্রদীপ তৈলশূন্য অথচ তাহার সমুজ্জ্বল দীপ্তির কিছুমাত্র হ্রাস নাই। মহারাজকে বিস্মিত দেখিয়া পুরোহিত বলিলেন "মহারাজ! বিস্মিত হইও না, ইহার নাম বাসনাদীপ্ত প্রদীপ; এই প্রদীপের নিম্ন ভূমিতে মহাদেব একটী দেবরত্ন রাখিয়া ইহা জ্বালাইয়া রাখিয়াছেন। যদি কেহ এই রত্নটী গ্রহণ করিতে সমর্থ হয়, তবেই এই প্রদীপ নিভিবে—নতুবা ইহার নির্ব্বাণ নাই।"

মহারাজ অতি আগ্রহের সহিত জিজ্ঞাসা করিলেন "সে রত্নটী কি?" পুরোহিত বলিলেন "উহা জগতের সার রত্ন, উহাকে লাভ

করিলে মনুষ্যের দেবত্ব হয়"। মহারাজের লোলুপ হৃদয় তাহা লাভ করিতে উৎসুক হইল, তিনি বলিলেন "ঐ রত্ন কিরূপে লাভ করা যায়?" পুরোহিত বলিলেন "ইহা লাভ করিতে হইলে পৃথিবীজয়ী হইতে হইবে, পৃথিবীজয়ী না হইলে উহা লাভের আশা বৃথা।"

মহারাজ তাহা লাভ করিতে কৃতসঙ্কল্প হইলেন। যাইবার সময় পুরোহিত তাঁহার হস্তে একটী কুশাঙ্গুরীয় পরাইয়া তাহাতে দেব-প্রদীপের কালী মাখাইয়া বলিলেন "যে দিন দেখিবে এই কালীর দাগ মুছিয়া গিয়াছে, সেই দিন বুঝিও তুমিও পৃথিবীজয়ী হইয়া এই রত্ন লাভের অধিকারী হইয়াছ—দীপ নিভিয়াছে।"

রাজা বাড়ী ফিরিয়া আসিলেন—দিগ্বিজয়ের সমস্ত আয়োজন হইল, মহারাজ দিগ্বিজয়ে গমন করিলেন। তখন রাজগণ ভারত জয় করিতে পারিলেই আপনাকে পৃথিবীজয়ী জ্ঞান করিতেন। বীরেন্দ্র সিংহ সমস্ত ভারতবর্ষ জয় করিয়া দেশে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন, আহ্লাদে হৃদয় উন্মত্ত, তিনি মানব হইয়া স্বীয় ক্ষমতায় দেবরত্ন লাভ করিবেন, এ পর্য্যন্ত ধরাধামে এরূপ সৌভাগ্য কাহারও ঘটে নাই;—কিন্তু সহসা তাঁহার সে আহ্লাদ দূর হইল, পুরোহিত কুশাঙ্গুরীয় পরাইয়া যে কথা বলিয়াছিলেন, তাহা মনে পড়িল, হস্তের দিকে চাহিয়া দেখিলেন অঙ্গুরীয়কের কালীর চিহ্ন যেমন তেমনি রহিয়াছে। মহারাজ নিরাশ হৃদয়ে মহামহোপাধ্যায় শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিতদিগকে আহ্বান করিলেন। মন্দিরের বৃত্তান্ত তাঁহাদিগকে বলিয়া এ সম্বন্ধে

তাঁহাদের পরামর্শ জিজ্ঞাসা করিলেন। পণ্ডিতগণ বলিলেন "পুরোহিতের কথানুরূপ আপনি পৃথিবী জয় করিলেন কিন্তু তাহা-তেও যখন অঙ্গুরীয়কের কালী মুছিল না, তখন পুরোহিতের কথার যথার্থ অর্থ তাহা নহে। পৃথিবীর রক্তপাতে যথার্থ পৃথিবী জয় হয় না ; যখন আপনি পৃথিবীর হৃদয় জয় করিতে পারিবেন, তখনই যথার্থ পৃথিবীজয়ী হইবেন। জগতের লোক ভয়দৃষ্টিতে আপনাকে মনুষ্যহন্তা বলিয়া না দেখিয়া যখন ভালবাসার চক্ষে, ভক্তির চক্ষে দেখিবে, যখন জগতের হৃদয় অধিকার করিবেন, তখনি আপনি পৃথিবী জয়ী হইতে পারিবেন।"

মহারাজ এই কথা সত্য বলিয়া বুঝিলেন ; রাজ্যের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত ধন রত্ন ঢালিয়া দিতে লাগিলেন, যশে জগৎ ধ্বনিত হইল, কিন্তু হায় ! রাজা ব্যথিত হৃদয়ে দেখিলেন তাঁহার অঙ্গুরীয়ক এখনও কালীময়। শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিতগণের কথাও ব্যর্থ দেখিয়া কালী মুছিবার উপায় জানিতে, তিনি ভগ্নহৃদয়ে আবার সেই দেবমন্দিরের পুরোহিতের নিকট যাত্রা করিলেন।

যাইবার সময় পথে একজন সন্ন্যাসী তাঁহাকে ম্লান দেখিয়া তাহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। সবিশেষ শুনিয়া সস্নেহে বলিলেন "বৎস, রক্তপাত করিয়া, কিম্বা যশের কামনা-পরবশ হইয়া পৃথিবীজয়ী নামের আশা করিও না। তাহাতে সে প্রদীপ নিভিবে না। যদি আত্ম জয় করিতে পার, তাহা হইলে তুমি যথার্থ পৃথিবীজয়ী হইবে ও তাহা হইলেই তুমি সেই দেবরত্নের অধি-কারী।

সন্ন্যাসীর কথায় মহারাজের চৈতন্ত হইল। তিনি মন্দিরে না গিয়া পথ হইতে বাটী ফিরিয়া আসিলেন। অন্যায়রূপে যে সকল রাজস্ব কাড়িয়া লইয়াছিলেন, তাহা ফিরাইয়া দিলেন, নিজের দুষ্প্রবৃত্তি সকল দমন করিয়া নিঃস্বার্থভাবে পরোপকারে কৃতসঙ্কল্প হইলেন। আন্তরিক প্রার্থনায় ঈশ্বর তাঁহার সহায় হইলেন—ক্রমে লোভ, ঈর্ষা, অহঙ্কার সকলি তাঁহাকে পরিত্যাগ করিল—তিনি ঈশ্বরে আত্ম সমর্পণ করিতে সমর্থ হইলেন। তখন তাঁহার হস্তের কালী মুছিয়া গেল, কিন্তু তখন আর কোন রত্ন লাভে তাঁহার বাসনা রহিল না। তিনি বাসনাহীন হৃদয়ে পুরোহিতকে ধন্যবাদ দিবার নিমিত্ত সেই মন্দিরোদ্দেশে গমন করিলেন; গিয়া দেখিলেন, প্রদীপ নিভিয়া গিয়াছে। পুরোহিত বলিলেন—"তুমি যে রত্ন লইতে আসিয়াছ, তাহা ইতিপূর্ব্বেই তোমার হইয়াছে—এই দেখ দীপ নির্ব্বাপিত। এখন তুমি কেবল মাত্র পৃথিবীজয়ী নহ—ত্রৈলোক্য জয়ী।"

বালকগণ, তোমরা কি বুঝিয়াছ এই গল্পটীর গূঢ়ার্থ কি? দুষ্প্রবৃত্তি মনুষ্য-হৃদয়ে সর্পস্বরূপ। মনুষ্যের গুণজ্যোতি হরণ করিয়া সে নিজে প্রতিভাত হয় কিন্তু মনুষ্যকে নিস্তেজ করিয়া রাখে। সেই সর্পের ধ্বংস দ্বারাই মনুষ্য তাহার মনুষ্যত্ব ফিরিয়া পায়।

——:o:——

দ্বি-প্রহর।

নিস্তব্ধ নিঝুম দিক,
শ্রান্তিভরে অনিমিখ
বসন্তের দ্বিপ্রহর বেলা।
রবির অনল কর,
শীতলিতে কলেবর
সরোবরে করিতেছে খেলা!

বায়ু বহে স্বন স্বন,
বিকম্পিত উপবন,
ঘুঘু ডাকে সকরুণ ডাক।
মাঝে মাঝে থেকে থেকে
কোথা হতে উঠে ডেকে
কঠোর গম্ভীর স্বরে কাক।

নীল নীলিমার গায়
শাদা মেঘ ভেসে যায়,
চিল উড়ে পাতার সমান।
চাতক সে ক্ষুদ্র পাখী
সকরুণ কণ্ঠে ডাকি
মেঘে চায় ডুবাইতে প্রাণ।

মুকুলিত আম্রশাখে,
পল্লবিত তরু থাকে,
কুহু কুহু কোকিল কুহরে
হিল্লোলিত সরো-কায়া,
ঘুমায় গাছের ছায়া,
গাভী নামি জল পান করে।

এলো চুলে মেয়েগুলি
কলস কোমরে তুলি
স্নান করি গৃহে ফিরে যায়।
একটি রাখাল ছেলে
দূরে মাঠে গরু ফেলে
কুঞ্জ বনে বাঁশরী বাজায়।

সঙ্গদোষ।

মোহজালস্য যোনির্হি মূঢ়ৈরেব সমাগমঃ
অহন্যহনি ধর্ম্মস্য যোনিঃ সাধুসমাগমঃ।

মূঢ় ব্যক্তিদিগের সহবাসে সমূহ মোহের উৎপত্তি হয়, এবং প্রতিদিন সাধুসংসর্গে নিশ্চিত ধর্ম্মের উৎপত্তি হয়।

সুবুদ্ধির পরামর্শে আমরা যেরূপ ভাল লোক হইতে পারি, এবং কুবুদ্ধির পরামর্শে যেমন মন্দলোক হইয়া পড়ি—সেইরূপ মন্দ লোকের সহবাসে আমরা মন্দ হইয়া যাই—সাধু সঙ্গে আমাদের সাধুতা বৃদ্ধি পায়। সেই জন্য সাধু-সঙ্গ যেমন প্রার্থনীয়, মন্দ সঙ্গও তেমনি পরিত্যাজ্য। ভাল লোক মন্দ সঙ্গে পড়িয়া মন্দ হইয়া গিয়াছে এমন অনেক গল্প শুনা যায়—আমি তাহার একটি তোমাদিগকে বলিতেছি।

আজ আশ্বিন মাসের সপ্তমী, বনগ্রামের চাটুয্যেদের বাড়ী মা আসিয়াছেন। প্রাতঃকালের সুমঙ্গল-ধ্বনি,—শঙ্খ, ঘণ্টা, ঢাক, ঢোল, সানাইয়ের উত্তেজনা-পূর্ণ মধুর গম্ভীর-তান সমস্ত গ্রামখানির হৃদয় ভক্তিস্রোতে তরঙ্গিত করিয়াছে।

সম্বৎসর-কাল শোকে যাহার হৃদয় পুড়িয়াছে, এই ভক্তির প্রভাবে তাহার হৃদয়েও আজ আনন্দ; সম্বৎসর যাহার

চোখের জল শুকায় নাই, আজ তাহারও মুখে হাসি ফুটি-য়াছে,—মা আসিয়াছেন —এমন আনন্দের দিনে সাংসারিক দুঃখ কে না ভুলিবে ? এমন দিনে যে না হাসিবে, তাহার জীবনে হাসিবার দিন আর আসিবে না।

আজ সকাল হইতে বনগ্রামের রাস্তার দৃশ্য ফিরিয়া গিয়াছে, গ্রামে এমন লোক নাই যে সাজ সজ্জা না করি-য়াছে, একখানি নূতন কাপড় না পরিয়াছে। গাঁয়ের বৌ ঝিগণ—যাহার যে ভাল কাপড়খানি আছে—যে গহনাগুলি আছে, তাহা পরিয়া, আলতা পায়ে দিয়া, ঘোমটা টানিয়া বৃদ্ধাদিগের সঙ্গে সঙ্গে ঠাকরুণ প্রণামে চলিয়াছে। বালক বালিকাগণ নূতন পরিচ্ছদে সাজিয়া মস্ত লোকের চালে—গম্ভীরভাবে চারিদিকে দৃষ্টিপাত করিতে করিতে, বৃদ্ধগণ হরি নামের মালা হস্তে, প্রীতি-গদগদ চিত্তে, হাস্যপূর্ণ উল্লাসিত উৎসাহিত যুবকমণ্ডলীর সহিত একত্রে পূজাগৃহে গমন করি-তেছে। বিশ্বজননীর আগমনে আজ গ্রাম কৃতার্থ, পবিত্র, শোভাময়, আনন্দ-বিভাসিত।

এইরূপে প্রাতঃকাল কাটিয়া গেল, ক্রমে দ্বিপ্রহরের বলি দানের সময় আসিয়া পড়িল,—পূজার দালানের সম্মুখের উঠানে বলিদানের আয়োজন হইয়াছে। গ্রামের যত ছেলেরা মনভরা অনন্দ, মুখভরা হাসি লইয়া এক যুগ আগে হইতে এখানে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে। কেবল দীননাথ এখানে নাই, দীননাথ ঠাকরুণ প্রণাম করিয়া সেই যে সকালে ঘরে গিয়াছে,

সেই অবধি আর তাহার দেখা নাই। দুই প্রহর অতীত হইয়া যায়, তথাপি দীননাথকে গৃহে দেখিয়া তাহার মা আশ্চর্য্য হইয়া বলিলেন—"হাঁ রে দীনু! বেলা দুপুর হইল, এখনি বলিদান হইবে—সব ছেলেরা এতক্ষণ পূজা বাড়ীতে—আর তুই যে এখনও ঘরে?"

দীননাথ বলিল—"না মা এ বেলা আমি আর পূজা-বাড়ীতে যাইব না। হরি, কানাই, শ্যাম কি আর কেহ আসিলে আমি বাড়ী আছি—একথা তুমি কাহাকেও বলিও না। বলিলে আর তাহাদের হাত ছাড়াইতে পারিব না।"

মা এই কথায় একটু ব্যস্ত হইয়া দীননাথের কপালে হাত দিয়া বলিলেন—"কেনরে বাছা পূজা দেখিতে যাইবি না কেন? কোন অসুখ করে নাই ত?" দীননাথ বলিল "না মা অসুখ কিছুই করে নাই, এখন পূজা বাড়ীতে পাঁঠা বলি হইবে, আমি বলি দেখিতে পারি না—তাই এবেলা যাইব না"।—

দীননাথ আর বেশী কথা কহিবার সময় পাইল না—তাহার কথা শেষ হইতে না হইতে "দীন কোথা—দীন কোথা" বলিয়া চীৎকার করিতে করিতে একদল ছেলে হুড় মুড় করিয়া ঘরের মধ্যে আসিয়া পড়িল। আর এড়াইবার সাধ্য কি—তাহাদের সঙ্গে সঙ্গে বলিদানের পাঁঠার মতই দীননাথ পূজা-বাড়ীর উঠানে আসিয়া দাঁড়াইল। তাহারা উঠানে পা দিতে না দিতে বলি-দানের শঙ্খ ঘণ্টা প্রভৃতি বাজনা বাজিয়া উঠিল, ধুপ ধুনার গন্ধে উঠান ভরিয়া গেল, পুরোহিত দালানে ছাগশিশু উৎসর্গ করিয়া বন্ধন করিয়া রাখিয়াছিলেন, একজন ব্রাহ্মণ সেই চন্দন-সিন্দুর

শোভিত, মাল্য-ভূষিত ছাগ আনিতে গেল, পুরোহিত হাড়িকাষ্ঠ পূজা করিয়া খড়্গ মন্ত্রপূত করিতে লাগিলেন। ব্রাহ্মণ ছাগ-ক্রোড়ে নিকটে আসিয়া দাঁড়াইল—ছাগশিশু তাহার ক্রোড় হইতে পলায়ন করিবার জন্য ছটফট করিতে করিতে চতুর্দ্দিকে আকুল নয়নে দৃষ্টিপাত করিয়া মর্ম্মভেদী স্বরে ডাকিতে লাগিল, যেন সে তাহার আসন্নকাল বুঝিতে পারিয়া কাতর কণ্ঠে অব্যক্ত ভাষায় বলিতে লাগিল—"আমি পশু, তোমরা মানব, আমি ক্ষুদ্র, তোমরা মহান। বুদ্ধিতে তোমরা সাগর উল্লঙ্ঘন করিয়াছ, আকাশ ভেদ করিয়াছ, দেবতাদের সমকক্ষ হইয়াছ। তবে তোমাদের তুলনায় কীট হইতেও কীটাণুবৎ যে আমি, আমার ক্ষুদ্র জীবন আরও ক্ষুদ্র করিয়া তোমাদের কিসের এত উৎসব? তবে কেন তোমাদের মানস-জননীকে রাক্ষসী অনুমান করিয়া তাঁহার এ সন্তানের রক্তপাতে তাঁহাকে প্রসন্ন করিবার প্রয়াসী হইয়াছ? ওগো দুর্ব্বলের বল, অসহায়ের সহায় কে আছ এখানে—যথার্থ মানব কে আছ এখানে—এই দুর্ব্বল অসহায়কে রক্ষা কর—আমার এই ক্ষুদ্র জীবন—যাহা তোমাদের কাছে কিছুই নহে, কিন্তু আমার নিকট অমূল্য, অসময়ে তাহার শেষ করিও না"। ছাগশিশুর সেই অস্ফুট ভাষা দীননাথ যেন বুঝিতে পারিল। সেই কাতর প্রার্থনা, সেই আকুল হৃদয়ের বিলাপ তাহার প্রাণে গিয়া যেন আঘাত করিল। তাহার হৃদয় ফাটিয়া চক্ষে জল আসিতে লাগিল।

পুরোহিত খড়্গ ছাগের গলায় ছুঁয়াইয়া কামারকে দিলেন। ছাগের গলা হাড়িকাঠে দেওয়া হইলে কর্ম্মকার সেই ভীষণ খড়্গ উত্তোলিত করিল। তাহার পর দীন আর কিছু দেখিতে পাইল না, তাহার মাথা ঘুরিয়া আসিল, চোখ মুদিয়া সে বসিয়া পড়িল। যখন চক্ষু খুলিয়া আবার দাঁড়াইল—দেখিল তখন আর পাঁঠা সেখানে নাই, বলিদানের স্থান রক্তপ্লাবিত। দেখিয়া বুঝিল বলিদান হইয়া গিয়াছে।

২

সেই দিন হইতে দীননাথের গ্রামে থাকা ভার হইয়া উঠিল। ছেলেরা তাহাকে দেখিলেই উপহাস করিতে থাকে। একজন তাহাকে সাড়ি পরাইয়া মেয়ে সাজাইতে চাহে, আর একজন অমনি গম্ভীরভাবে বলিয়া উঠে—"হাঁ হাঁ এমনো কথা! ইনি আমাদের সিপাই পুরুষ, ইহাঁকে গ্রামের সীমানায় দাঁড় করাইয়া দিলে আর কোন ভাবনাই থাকিবে না,"—আর একজন বলিয়া উঠে—"হাঁ বীর বই কি,—তা আবার বলিতে, সে দিন পাঁঠাবলি দেখিয়া মূর্চ্ছা গিয়াছিলেন! বীরের হাতে গোটাকতক পাঁকাটীর লাঠী আনিয়া দাও।"

এইরূপে গ্রাম-শুদ্ধ ছেলেরা দীনর প্রাণান্ত করিয়া তুলিয়াছে, উপহাসের জ্বালায় সে অস্থির। দীন বেচারা অস্থির হইয়া কিসে যে তাহাদের হাত হইতে উদ্ধার পাইবে, তাহা ভাবিয়া পায় না। কিসে তাহারা আবার তাহাকে ভাল বলিবে—প্রাণপণে তাহার চেষ্টা করে। ছেলেরা পাখীর ছানা পাড়িতে গেলে

দীন উমেদার হইয়া তাহাদের সঙ্গে যায়, আগেভাগে তাড়াতাড়ি গাছে উঠিয়া পুরুষত্ব দেখাইবার চেষ্টা করে। এরূপ কাজ যদিও তাহার একেবারেই ভাল লাগে না, তথাপি সে লজ্জার খাতিরে, উপহাসের ভয়ে তাহা করিতে প্রস্তুত। দীন বড় দুর্ব্বল, সে তাহার সঙ্গীদিগের উপহাস কোন মতেই সহিতে পারে না। বরঞ্চ সে পাখীর ছানা পাড়িয়া—নিজের ইচ্ছার বিরুদ্ধে কাজ করিয়া মনে মনে কষ্ট সহিতে পারে, তথাপি বন্ধুদের হাসিবার কাজ করিয়া উপহাসের পাত্র হইতে চাহে না। ছেলেরা দড়িতে ঢিল ঘুরাইয়া তাহা ছুঁড়িয়া পাখী মারে,—দীন আগে কখনও তাহা করিত না কিন্তু সেই ঘটনার পর হইতে সে নিজেই অগ্রসর হইয়া ঢিল ছুঁড়ে। এইরূপে নানা প্রকারে আপনার বীরত্ব দেখাইয়া সঙ্গীদের মন হইতে সেই দিনকার কথাটা মুছিয়া ফেলিতে চায়।

একদিন গ্রামের দুই চারিজন বালক পাখী মারিতে যাইবে স্থির করিয়া দীননাথের বাড়ীতে আসিয়া উপস্থিত হইল। তাহাদের দেখিয়া দীন বুঝিল তাহারা তাহাকে পাখী মারিতে যাইবার জন্য ডাকিতে আসিয়াছে। এ পর্য্যন্ত সে কেবল গাছের ডাল পাতা প্রভৃতি লক্ষ্য করিয়া ঢিল ছুঁড়িত, কখনও জীবহত্যা করে নাই। সেই জন্য উহাদিগকে দেখিবামাত্র তাহার মুখ শুকাইয়া গেল। একজন বালক বলিল— "দীননাথ—এইবার তোমার সাহসের পরিচয়টা দেও, আজ কটা পাখী মারিবে বল দেখি?"

দীন বলিতে যাইতেছিল—"আজ শরীরটা বড় ভাল নাই,—মা তাই কোথাও যাইতে দিবেন না।"

কিন্তু সে কথা কহিবার আগেই আর একজন উপহাস করিয়া বলিল—"দীনু সিংহ—কটা পাখী মারিবে—তা আর জিজ্ঞাসা করিতে? অসংখ্য!"

এই কথায় মহা হাস্য কোলাহল পড়িয়া গেল, দীন মহা লজ্জিত হইল, তাহার অত্যন্ত কষ্ট হইল। মনে মনে সে বলিল—"হা ভগবান—কেন তুমি আমাকে এমন দুর্ব্বল স্ত্রীলোকের প্রাণ দিয়া গড়িয়াছিলে? আমার কি বাস্তবিক একটুও পুরুষত্ব নাই? পদে পদে আমি সকলের নিকট উপহাসাস্পদ হইব।"

দীন নিজের দুর্ব্বলতা জয় করিতে দৃঢ়সঙ্কল্প হইল। হায়! পুরুষত্ব ও নিষ্ঠুরতার মধ্যে যে অনেক প্রভেদ—তাহা সে বুঝিল না। দীন উত্তেজিত স্বরে বলিল—"কবে ছেলেবেলায় কি করিয়াছি—তাহার জন্য কি চিরকালই আমাকে ঠাট্টা করিবে? তোমাদের সকলের আগেই আজ আমি পাখী মারিব"—

বালকেরা দীনর কথা শুনিয়া সন্তুষ্ট হইল এবং সকলে মিলিয়া পাখী মারিতে যাত্রা করিল। প্রথমেই যে পাখীটি দেখিতে পাইল, সেইটিকে দেখাইয়া একজন বালক বলিল "পালোয়ান-জি এইবার—এইবার"—

এই ব্যঙ্গোক্তি শুনিলেই দীনর গা জ্বলিয়া যাইত। যদিও বা

সে পাখী মারিতে একটু ইতস্তত: করিত কিন্তু এই উপহাস-বাক্য তাহার মর্ম্মান্তিক হওয়ায় সে আর কথাটি না কহিয়া উত্তেজিত মনে পাখীটিকে লক্ষ্য করিয়া ঢিল ছুঁড়িল। বৃন্তচ্যুত কুসুমের ন্যায় পাখীটি ভূমিতে পড়িয়া ছটফট করিতে লাগিল, তাহার আহত স্থান হইতে দুই এক বিন্দু শোণিতও মাটিতে পড়িল।

দীনর এই প্রথম হাতে খড়ি, ইহার আগে সে নিজে রক্তপাত করিয়া তাহা কখনও দেখে নাই। দীনর প্রাণের ভিতর হইতে অশ্রুজল উথলিয়া উঠিতে লাগিল। কিন্তু পাছে অন্যান্য বালকেরা তাহা বুঝিতে পারে, এই ভয়ে প্রাণপণে তাহা সম্বরণ করিয়া লইল। বালকেরা পাখীটি হস্তগত হইয়াছে দেখিয়া আহ্লাদে চীৎকার করিয়া উঠিল, এবং দীনকে প্রশংসা করিতে করিতে অন্য পাখীর চেষ্টায় ঘুরিতে লাগিল।

৩

ইহার পর চারি পাঁচ বৎসর চলিয়া গিয়াছে। এখন বনগ্রামের অনেক পরিবর্ত্তন হইয়াছে, এখন আর উহাকে সেই গ্রাম বলিয়া চেনা যায় না। পূর্ব্বকার ভদ্রপল্লী ও গ্রাম্য কুটীরের স্থলে এখন নূতন বড়মানুষদিগের এবং নীলকর সাহেবের বড় বড় বাড়ী ধপধপ করিতেছে।

তখনকার অনেক লোক এখন গ্রাম ত্যাগ করিয়া গিয়াছে বালকমণ্ডল যুবা হইয়া উঠিয়াছে, কত নূতন লোকের আবির্ভাব, কত পুরাতন লোকের তিরোভাব হইয়াছে।

আজ আবার সেই সপ্তমী পূজা, কিন্তু চাটুয্যেদের বাড়ী এখন

আর পূজা হয় না, মকদ্দমায় তাহারা সর্ব্বস্বান্ত হইয়া গিয়াছে। নীলকরের দাওয়ান নবীন ঘোষের বাড়ী আজ পূজার বড় ধূম। কিন্তু চাটুয্যেদের বাড়ীর পূজাতে আবাল বৃদ্ধ বনিতা যত সুখী হইত, এ পূজায় যেন তাহাদের তত সুখ হয় না। উঠানে বালক ও যুবকেরা দাঁড়াইয়া আছে, এখনি বলিদান হইবে; কিন্তু যুবকদিগের মনে সেই ছেলেবেলার কথা জাগিয়া উঠিতেছে। চাটুয্যেদের কর্ত্তা মহাশয় কেমন ভাল লোক ছিলেন, বড় বাবু কেমন সকলের সহিত প্রিয়-সম্ভাষণ পূর্ব্বক কথাবার্ত্তা কহিতেন। অমন বুনিয়াদি ঘর—একেবারে উৎসন্ন গেল। আর এই নবীন ঘোষ, দুদিন আগে লাঙ্গল ধরিতে ধরিতে যাহার প্রাণ ওষ্ঠাগত হইয়াছে—তিনি আজ বাবু হইয়া কাহারও প্রতি চাহিয়া একবার কথা কহেন না!

পূর্ব্ববৎ অনুষ্ঠান শেষ হইলে ছাগশিশু হাড়িকাঠে বদ্ধ হইল, কামার খড়্গ উঠাইতে উদ্যত হইয়াছে, এমন সময় একটা কোলাহল পড়িয়া গেল, পুরোহিত বলিলেন—"নবকামার, তুমি থাম থাম।"

হারুর মা ছুটিয়া আসিয়া বলিল "ঠাকুরমহাশয় নবকামার যেন এবার পাঁঠা বলিদান না করে—কর্ত্তামা বড় ক্ষাপা হইয়াছেন। আর বারে সে এক কোপে কাটিতে পারে নাই—সেই অমঙ্গলে আমাদের দাদাবাবুর খোকাটি মারা গেল—এবার যেন নব খাঁড়া হাতে না করে।" বলিতে বলিতে রামার মা শ্যামার মা দৌড়িয়া আসিয়া ঐ একই কথা বলিতে লাগিল, স্বয়ং বাড়ীর

কর্ত্তা নবীন ঘোষ দৌড়িয়া আসিয়া বলিলেন—"ঠাকুরমহাশয়! নব কামারকে খাঁড়া ছুঁইতে দিবেন না—তাহা হইলে মা এবার রক্ষা রাখিবেন না।"

উঠানে একটা গোলমাল বাধিয়া গেল, সকলে বলিয়া উঠিল—"কে তবে বলিদান করিবে? একজন কামার ডাকিয়া আন"—

এই সময় একজন লোক ভিড়ের মধ্য হইতে ছুটিয়া আসিয়া নব কামারের হাত হইতে খড়্গ কাড়িয়া লইয়া বলিল—"আমি করিব।"

পুরোহিত বলিলেন—"এস বাপু দীন কামার, তোমার বড় ডাক নাম—মা প্রসন্ন হউন।"—

যে দীননাথ একদিন পাঁঠা বলি দেখিয়া মাথা ঘুরিয়া পড়িয়া গিয়াছিল—আজ সে হাসিতে হাসিতে সঙ্গীদের উল্লাসধ্বনির মধ্যে স্বহস্তে বলিদান করিল। খড়্গ উঠাইয়া ছাগের কণ্ঠচ্ছেদ করিবার সময় আজ একবারও তাহার হাত কাঁপিল না—হৃদয় ব্যথিত হইল না, সে যখন বলিদান করিয়া ফিরিয়া আসিল, তখনও তাহার মুখে হাসির রেখা বিলীন হয় নাই।

এত পরিবর্ত্তন তাহার কিসে? কেবল সঙ্গদোষে!

ঝটিকা। *

মেঘে মেঘে মেঘে, ছেয়েছে আকাশ,
দেখা নাহি যায় চাঁদিমা আর,
নদীর উরসে ঢেউ সাথে চলি
খেলে না জোছনা রজত ধার।

মৃদুল পবন বহেনাক আর
গাছের একটি পাতা না নড়ে,
বহে কি না বহে তটিনী কে জানে
ঢেউ ত একটি নাহিক পড়ে।

আঁধার আকাশ স্তম্ভিত ধরণী
মন্ত্রস্তব্ধ যেন চারিটি ধার!
কি বিপ্লব কথা নীরবে কহিছে
থাকে না বুঝি বা জগৎ আর!

তটিনীর কূলে কুঁড়ে ঘর খানি
দ্বারের বাহিরে জেলেনী, জেলে,—
ভয়াকুল প্রাণে আছে দাঁড়াইয়ে
কুটীরের স্নিগ্ধ আলোক ফেলে।

---

* "গাথা" হইতে ঝটিকার বর্ণনা অংশ গৃহীত।

সহসা অশনি কড় মড় কড়
ঘোষিল ভেদিয়া আঁধার নিশি !
নিবিড় জলদ ভীম গরজনে
সঘনে কাঁপায়ে তুলিল দিশি !

বীর পরাক্রমে এদিকে ওদিকে
মাতিয়ে বহিল পবন রাশি,
ধাঁধিয়ে দিগন্ত বেড়াইছে ছুটে
সুবিকট ঐ দামিনী হাসি।

নাহি সে তটিনী প্রশান্ত মূরতি
ভীষণ সংহার-মূরতি তার !
সফেন-তুফানে আক্রেমিছে বেলা
দুর্দ্দাড় ভাঙ্গিয়ে ফেলিছে পাড় !

সহসা উঠিল করুণ ক্রন্দন !
তরী একখানি যেন রে ডোবে !
কাঁপিয়ে উঠিল ধীবর দম্পতি
হৃদয় দহিল দারুণ ক্ষোভে।

বলিল জেলেনী "ঐ শুন আহা
কোন অভাগার জীবন যায় !"
ততক্ষণ ছুটি, খুলি দিয়ে খুঁটি
করুণ ধীবর উঠিল 'না'য়।

এ কালনিশায় নাহি ভুরুক্ষেপি
বায়ুবেগে ঐ চলিল তরী।
আকুল পরাণে তীরে দাঁড়াইয়ে
কর যোড়ে সতী স্মরিল হরি।

কত রজনীতে কত ঝটিকায়
সাহসী দয়ার্দ্র সোয়ামী তার
কত মরণেরে করেছে বারণ
কতই বিপদ করিয়ে সার।

সমুখে জাগিল সেই সব ছবি
পরাণ ভরিয়া গাহিল জয়,
পরাণ ভরিয়া ডাকিল হরিরে
'তার' এ বিপদে করুণাময়'।

চলিল তরণী তুফানে তুফানে
কভু পড়ে পুনঃ উঠিছে কভু,
অটল-হৃদয় সাহসী ধীবর,
কোন ভয় ডর নাহিক তবু।

মনে তার শুধু জাগে সে রোদন,
ঝটিকা তুফানে চেয়ে না চায়,
কেবলি হাঁকিছে—"কোথায় রে তোরা
ভয় নেই আর—নে যাব আয়।"

তবুও উত্তর নাহি দিল কেহ,
রোদনও আর ত শোনা না যায়,
অধীর হৃদয়ে বাহি চলে জেলে
ঝটিকায় তরী রাখাও দায়।

তুফানের পর উঠিছে তুফান—
গেল গেল তরী নাহিক আশ,
নাহি ভ্রূক্ষেপ সে দিকে তাহার
জলে চেয়ে দেখে চুলের রাশ!

ঝাঁপাইয়ে পড়ি চোখের নিমেষে
পিঠের উপর দেহটি তুলে,—
তরঙ্গের সাথে যুঝিয়া যুঝিয়া
প্রাণপণে জেলে উঠিল কূলে।

জেলেনী দাঁড়ায়ে স্তম্ভিত মূরতি,
নামাইল দেহ তাহার কাছে,
অবসন্ন প্রাণ রুদ্ধশ্বাস-দেহ
আপনি লুটিয়ে পড়িল পাছে!

———•———

সত্য।

নাস্তি সত্যসমোধর্ম্মো ন সত্যাৎ বিদ্যতে পরম্।
নহি তীব্রতরং কিঞ্চদনৃতাদিহ বিদ্যতে॥

সত্যের সমান ধর্ম্ম নাই—সত্য অপেক্ষা শ্রেষ্ঠও আর কিছু নাই, এবং মিথ্যা অপেক্ষা ঘোর অনিষ্টকর পদার্থ জগতে লক্ষিত হয় না।

সত্যনিষ্ঠা সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ধর্ম্মনীতি। কারণ, যাহা ন্যায় তাহাই সত্য, যাহা পুণ্য তাহাই সত্য, আর যাহা অন্যায় যাহা পাপ তাহাই মিথ্যা। পূর্ব্বকালে ভারতবর্ষীয়গণের সত্যের প্রতি গাঢ় অনুরাগ ছিল বলিয়া তাঁহারা বড়লোকও হইয়াছিলেন। দশরথ সত্য রক্ষার জন্য তাঁহার প্রাণাধিক পুত্র রামকে বনবাস দিয়াছিলেন। আমরা বড় লোক হইতে ইচ্ছা করি কিন্তু যতদিন আমাদের সত্যের প্রতি প্রবল অনুরাগ না হইবে—ততদিন আমাদের সে আশা বৃথা! তুমি যদি বড় লোক হইতে চাও, কখনও মিথ্যা বলিও না। দৈবাৎ অন্যায় কার্য্য করিলে পিতা মাতার ভয়ে মিথ্যা বলিয়া তাহা লুকাইবার চেষ্টা করিও না। যাহার সত্য বলিবার সাহস আছে—পিতামাতা তাহাকে ক্ষমা করেন। যদিই বা তাঁহারা তোমাকে ক্ষমা না করিয়া তোমার দোষের জন্য তোমাকে ভৎ'সনা বা অন্য, কোনরূপ শাস্তি প্রদান করেন, তাহা হইলেও তোমার সত্য বলিতে বিরত হওয়া উচিত নহে। কারণ, সন্তানের মঙ্গল

কামনা করিয়াই—অর্থাৎ যাহাতে সে ভবিষ্যতে ঐরূপ গর্হিত কার্য্য পুনরায় না করে, এই অভিপ্রায়েই পিতামাতা সন্তানকে দণ্ড বিধান করেন। সুতরাং দণ্ড ভয়ে ভীত না হইয়া তাহা সহ্য করাই মনুষ্যত্ব। সেই দণ্ড দ্বারা তোমার ন্যায়ান্যায় বোধ, কর্ত্তব্যা-কর্ত্তব্য শিক্ষালাভ হইবে; সেই সামান্য কষ্ট সহ্য করিয়া তুমি মানুষ নামের যোগ্য হইবে—ইহা হইতে সুখের বিষয় আর কি আছে! একটি বালক কিরূপ স্থলে সত্য পালন করিয়া জগতের পূজনীয় হইয়াছেন তাহা শুনিবে?

একদা একদল মুসলমান-যাত্রী বোগদাদ নগরে যাইতেছিল। সন্ধ্যা হইয়া পড়িয়াছে এখনো তাহারা প্রান্তর পথ উত্তীর্ণ হইতে পারে নাই, দারুণ শীতে তাহাদের শোণিত যেন বরফের মত জমাট বাঁধিয়া আসিতেছে; নিকটে বসতির চিহ্নমাত্র নাই; সুদূরে কোন দীপের ক্ষীণালোকও দেখিতে পাওয়া যাইতেছে না—যে তাহা দেখিয়া তাহাদের নৈরাশ্যপূর্ণ হৃদয়ে কথঞ্চিত আশার উদ্রেক হয়, তথাপি তাহারা লক্ষ্যহীন, নিরাশ-হৃদয়ে অগ্রসর হইতেছে। সহসা তাহারা চমকিয়া উঠিল, একদল দস্যু ভীষণ চীৎকার করিয়া তাহাদের নিকটবর্ত্তী হইল। দেখিতে দেখিতে দস্যুদল কর্ত্তৃক তাহারা আক্রান্ত ও পরাভূত হইল। প্রান্তরের সীমানায় ক্ষুদ্র পাহাড়ের অন্তরালে দস্যুদিগের বসতি,—যাত্রীদিগকে বন্দী করিয়া তাহারা সেইখানে লইয়া গেল, এবং তাহাদিগের সর্ব্বস্ব অপহরণ করিয়া লইল। যাত্রীদিগের

মধ্যে একটী বালক ছিল, কেবল তাহার নিকটে দস্যুগণ এক কপর্দ্দকও পাইল না। তাহার বস্ত্রাদি উত্তমরূপে অনুসন্ধান করিবার পর একজন দস্যু তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল—"তোমার কাছে কিছুই নাই?"

বালক বলিল—"আছে।"

দস্যু ভাবিল বালক উপহাস করিতেছে। সে বলিল—"কি আছে?"

বালক বলিল—"৪০ টি মুদ্রা আমার কাপড়ের ভিতর আছে।" সে বালকের কাপড় বেশ করিয়া দেখিয়াছিল, সুতরাং এই কথায় হাসিতে লাগিল। আর একজন বলিল—

"ঠাট্টা করিতেছিস্?"

বালক বলিল—"ঠাট্টা নয়, আমি ত বলিলাম—আমার কাছে ৪০টি মুদ্রা আছে।"

এই সময় তাহাদের দলপতি আসিয়া উপস্থিত হইল। সে শুনিল বালকের কাছে কিছু পাওয়া যায় নাই। সে আবার বালককে জিজ্ঞাসা করিল—"তোর কাছে কিছু নাই?"

বালক বলিল "আমি ত পূর্ব্বেই বলিয়াছি আছে।"

দস্যুপতি। "কি আছে?"

বালক। "৪০ টি মুদ্রা।"

দলপতি। "কোথায় আছে?"

বালক বলিল—"আমার কাপড়ের মধ্যে সেলাই করা আছে।"

দস্যুপতি তাহার কাপড়ের সেলাই খুলিয়া দেখিল সত্যই

৪০টি মুদ্রা আছে। সে তখন আশ্চর্য্য হইয়া বলিল—"তুমি নির্ব্বোধের ন্যায় কেন বলিলে তোমার কাছে মুদ্রা আছে? মুদ্রা যেরূপে লুকান ছিল—তুমি না বলিলে ত কেহ জানিতে পারিত না। বলিবে ত এরূপে লুকাইবার কি দরকার?"

বালক বলিল "মা আমাকে বলিয়াছেন কথনও মিথ্যা বলিও না।"

এই কথায় হঠাৎ দস্যু-পতির মনের ভাব পরিবর্ত্তিত হইল, সে বলিল—"হায়! এই ক্ষুদ্র বালক তাহার মাতার আজ্ঞা এইরূপে পালন করিতে শিখিয়াছে— আর আমি বৃদ্ধ হইয়া গেলাম, এখনও পরম পিতা ঈশ্বরের আজ্ঞা পালন করিতে শিখিলাম না!"

দস্যুপতি অনুতপ্ত-হৃদয়ে বালকের হাত ধরিয়া বলিল,—"আমি তোমার হাত ধরিয়া এই শপথ করিতেছি আর আমি কথনও ঈশ্বরের আজ্ঞা অমান্য করিব না।"

তাহার সঙ্গীগণ এতক্ষণ অবাক হইয়া সমস্ত শুনিতেছিল—এখন সকলে দস্যুপতির নিকট অগ্রসর হইয়া বলিল, "প্রভু এই বালকের কথায় আমাদেরও চৈতন্য হইয়াছে। আমরাও পাপ-পথ পরিত্যাগ করিব। আপনি পাপ-পথে আমাদের পথ প্রদর্শক ছিলেন, পুণ্যপথেও আমাদের নেতা হউন।"

সেই দিন হইতে দস্যুগণ সমস্ত অপহৃত ধন ফিরাইয়া দিয়া ধর্ম্ম-জীবন অবলম্বন করিল।

সেই বালকের নাম আবদুল কাদির। পারস্য ইতিহাসের ইনি একজন বিখ্যাত ব্যক্তি।

———:•:———

বাগানেতে খেলা।

১

বাগানে ফুটেছে ফুল
কত বরণের আহা!
কি সুন্দর সাজিয়াছে
বলিতে না পারি তাহা।

২

কেউ শাদা ধবধবে
কেউ রাঙ্গা টুকটুক!
কেউ বা শতেক রং
কারো বা সোণার মুখ!

৩

ধীরে ধীরে বহে বায়ু
ধীরে মেঘ খেলিতেছে,
গাছের আড়ালে হোথা
চাঁদ উঁকি মারিতেছে।

৪

বালক বালিকা দুটি
খেলিছে মনের সুখে,
করিতেছে ছুটাছুটি
হাসি না ধরিছে মুখে।

৫

"আয় হেথা আয় বোন
দেখ হেথা দেখ চেয়ে,
বকুলের ফুলে আহা
তলাটি ফেলেছে ছেয়ে।"

৬

"আমি দাদা এক ছড়া
গাঁথি ভাই জুঁই-মালা,
তোমারে পরায়ে দিয়ে
আবার করিব খেলা।"

৭

"ওই দিক পানে চেয়ে
একবার দেখ বোন!
গোলাপ একটি ফুটি
রূপে আলো করি বন।"

৮

"আহা কি সুন্দর ফুল!
দাওনা আমারে পাড়ি,
মাকে গিয়ে দিব আমি
যখন যাইব বাড়ী।"

৯

মেঘ সনে চাঁদ হোথা
খেলিতেছে লুকোচুরী,
বালিকা, খেলিতে সাধ,
ডাকিল আদর করি।

১০

"এস চাঁদ মেঘ সনে
শুধু লুকোচুরি খেলো,
খেলিবে মোদের সাথে
কত খেলা আরো ভালো।"

১১

"মিছে ডেকে কাজ নেই
আসিবে না, বোন! শশি—
রাখিবারে কথা তোর,
ঐ—তারাটি পড়িল খসি!"

১২

"আমি যদি ওগো দাদা
এক রাশ তারা পাই,
তাহ'লে গাঁথিয়ে মালা
তোমারে পরাই ভাই!"

১৩

"চল তবে চল বোন
কাজ নেই করে দেরী,
রাত হয়ে এল ঐ
চল যাই ঘরে ফিরি।"

১৪

"কেমন সুখেতে আজ
দিন কেটে গেল ভাই,
প্রণমি বিভুর পায়ে
চল এবে ঘরে যাই।"

শ্রীহিরণ্ময়ী দেবী।

—————•:•—————

ক্ষমা।

অক্রোধেন জয়েৎ ক্রোধং অসাধুং সাধুনা জয়েৎ।
জয়েৎ কদর্য্যং দানেন জয়েৎ সত্যেন চানৃতং॥

ক্ষমা দ্বারা ক্রোধকে জয় করিবেক, সাধুতা দ্বারা অসাধুতাকে জয় করিবেক, উপকার দ্বারা অপকারীকে জয় করিবেক, এবং সত্য দ্বারা মিথ্যাকে জয় করিবেক।

সংসারের সকলেই ক্ষমার প্রত্যাশী। ইচ্ছা করিয়াই হউক, আর অনিচ্ছাতেই হউক পরস্পর সকলেই সকলের নিকট কোন না কোন সময়ে অপরাধী হইয়াই থাকে। কিন্তু প্রত্যেকেই যদি প্রত্যেকের অপরাধের প্রতিশোধ গ্রহণ করেন, তাহা হইলে সংসার কি অশান্তির আলয় হইয়া উঠে! বস্তুতঃ সংসারে ক্ষমা পাওয়া যায় বলিয়াই সংসারে শান্তি আছে।

অন্যকে ভালবাসিতে পারিলে ক্ষমা করা অতি সহজ। আমরা আপনার লোকদিগকে ভালবাসি, তাই তাঁহাদিগকে সর্ব্বদাই ক্ষমা করিয়া থাকি। যাঁহারা মহৎ লোক, তাঁহারা পরকেও আপনার মত ভালবাসেন, তাই শত্রুকেও তাঁহারা ক্ষমা করেন,—অপকারীর উপকার করিয়া তাঁহারা তাহার প্রতিশোধ গ্রহণ করেন। ইহাই যথার্থ প্রতিশোধ, কেন না এইরূপ প্রতিশোধে শত্রুও মিত্র হয়।

তুমি যদি অন্যের নিকট ক্ষমা পাইতে চাহ, তবে অন্যকে ক্ষমা করিতে শিখ। যদি শত্রুকেও মিত্র করিতে চাও, তবে উপকার করিয়া তৎকৃত অপকারের প্রতিশোধ প্রদান কর।

রায়পুরের বাগানটির বড় শোভা হইয়াছে। গাছে গাছে লতা উঠিয়াছে, পাতায় পাতায় বিকাল বেলার সূর্য্যের সোণার কিরণ ঝিকঝিক করিতেছে, বকুল ও কামিনীর তলায় ফুলের তারা ফুটিতে আরম্ভ হইয়াছে। বাগানের মাঝে মাঝে দূর্ব্বাদলের ঘন বনগুলি ছোট ছোট ছেলে মেয়েদিগের জন্য বিছানা পাতিয়া রাখিয়াছে। রায়পুরের যত বালিকা এ সময় এখানে খেলিতে আসিয়াছে। কেহবা ফুল কুড়াইতেছে, কেহবা ঘুটিম খেলিতেছে, কেহবা গাছের তলায় ছুটাছুটি করিয়া বেড়াইতেছে।

ঐখানে একটি বকুল গাছের তলায় অমলা ও বিমলা ফুল কুড়াইতে মত্ত। টুপটাপ করিয়া একবার এখানে, একবার ওখানে, একবার অমলার মাথায়, একবার বিমলার গায়ে ফুল পড়িতেছে। তাহারা একটি তুলিতে গিয়া একটি মাড়াইতেছে, কতকগুলি আঁচলে রাখিবার সময় কতকগুলি ফেলিয়া দিতেছে।

ফুল আঁচলে রাখিতে রাখিতে বিমলা একবার উঠিয়া দাঁড়াইল, বুঝি তখন কাহাকে এই দিকে আসিতে দেখিল, সে হঠাৎ বলিয়া উঠিল—"ও অমলা, ঐ দিকে চল ভাই, ঐ আস্‌ছে।" ভয়ে অমলার আঁচল হইতে ফুল পড়িয়া গেল, আর পা সরিল না, থতমত খাইয়া দাঁড়াইল।

দেখিতে দেখিতে লক্ষ্মী আসিয়া উপস্থিত হইল। লক্ষ্মী অন্য বালিকাদের প্রতি বড় অত্যাচার করিত। সেইজন্য তাহাকে সকলে যমের মত ভয় করে। কিন্তু লক্ষ্মীর পিতা গ্রামের মধ্যে ধনী, সেই জন্য লক্ষ্মী যাহাই করুক—অন্য কেহ তাহাতে কথা কহিতে সাহস করিত না। লক্ষ্মীও দেখে কিছুতেই তাহার শাস্তি হয় না, সেও নির্ভয়ে যাহা ইচ্ছা তাহাই করে।

লক্ষ্মী আসিয়া মুখ বাঁকাইয়া, চোখ রাঙ্গাইয়া অমলার হাত ধরিয়া হড় হড় করিয়া টানিতে টানিতে বিমলাকে বলিল—"বলি বিমলা, তোদের কি বুকের পাটা! সে দিন বারণ করিয়াছি এ গাছের তলায় তোরা কেহই ফুল কুড়াইবি না, আবার আসিয়াছিস? এবার এখানে দেখিতে পাইলে হাড় ভাঙ্গিয়া দিব।" অমলা ভয়ে কাঁদিয়া ফেলিল, বিমলা আস্তে আস্তে অমলার হাত ধরিয়া সেখান হইতে চলিয়া গেল। লক্ষ্মী তাহাদের আঁচলের ফুল আপনার আঁচলে লইয়া চারিদিকে ছড়াইতে ছড়াইতে কিছু দূরে যেখানে কয়েকটি বালিকা ঘুটিম খেলিতেছিল, সেইখানে আসিয়া দাঁড়াইল। লক্ষ্মীকে দেখিয়া বালিকাগুলি একটু ভয়ে ভয়ে খেলিতে লাগিল।

লক্ষ্মী বলিল "আমি খেলিব।"

এক জন আস্তে আস্তে বলিল "এ হাতটা আগে হার জিৎ হইয়া যাউক।"

লক্ষ্মীর রাগ হইল, সে বলিল "কি আমাকে লইয়া খেলিবি নে? দেখিব তোদের এ হাত কে খেলিতে দেয়!" বলিয়া সমস্ত

ঘুঁটিগুলি চারিদিকে ফেলিয়া দিয়া রাগে গর্ গর্ করিতে করিতে চলিয়া গেল। সে মুখ ফিরাইবামাত্র তাহার পৃষ্ঠদেশ লক্ষ্য করিয়া মারিবার ছলে সকল বালিকারা হাত উঠাইয়া আস্তে আস্তে গালি দিতে লাগিল। তাহার সাক্ষাতে ত কেহ ভয়ে কিছু বলিতে পারে না, কাজেই সকলে তাহার পশ্চাতে এইরূপে শোধ তুলিয়া থাকে।

লক্ষ্মী সেখান হইতে চলিয়া আসিয়া দেখিল কুসুম পুকুর ধারের কেয়াফুলের গাছ হইতে ফুল ছিঁড়িতেছে। লক্ষ্মী একে রাগিয়া আছে, তাহাতে আবার কুসুমকে কেয়াফুল ছিঁড়িতে দেখিয়া আরও জ্বলিয়া উঠিল, লক্ষ্মী জানে সে বাগানের ফুলে লক্ষ্মী ভিন্ন আর কাহারও অধিকার নাই, কিছু না কহিয়া না বলিয়া তাড়াতাড়ি আসিয়াই লক্ষ্মী কুসুমকে এক চড় মারিল, কিন্তু চড় মারিয়া হাত সরাইয়া লইবার সময় সেই ফুলগাছের পাতার কাঁটায় বিঁধিয়া তাহার হাত দিয়া রক্ত পড়িতে লাগিল।

কুসুমের প্রাণে তাহাতে বড় বেদনা লাগিল, লক্ষ্মী যে তাহাকে মারিয়াছে, লক্ষ্মী যে তাহার প্রতি অত্যাচার করে, সে তাহা ভুলিয়া গেল। কাঁদকাঁদ-চোখে কুসুম লক্ষ্মীকে ধরিয়া পুষ্করিণীর ধারে আনিয়া বসাইল, তাহার পর আপনার আঁচল ভিজাইয়া তাহার হাতে বার বার জল দিতে লাগিল।

লক্ষ্মী কাহারও নিকট এরূপ প্রতিশোধ পায় নাই; লজ্জায়, অনুতাপে সে মরিয়া গেল। সে যেন সহসা দিব্যজ্ঞান লাভ করিল। ক্ষণকাল পরে লক্ষ্মী বলিল—"কুসুম আজ তুমি আমাকে

যাহা শিক্ষা দিলে, এ পর্য্যন্ত তাহা আমাকে কেহ শিখায় নাই। তোমার এ উপকার আমি জন্মে ভুলিব না; তোমার এই করুণা মনে করিয়া আমি তোমার মত ভাল হইতে চেষ্টা করিব।"

সত্যই সেই হইতে লক্ষ্মীর স্বভাব একেবারে পরিবর্ত্তিত হইয়া গেল। আর লক্ষ্মীকে কাহারও প্রতি অত্যাচার করিতে দেখা যায় না। যখনি অভ্যাস বশতঃ লক্ষ্মী কাহাকেও মারিতে যায়, অমনি সেইদিনকার ঘটনাটি মনে পড়ে, অমনি তাহার মনে অনুতাপ জাগিয়া উঠে, এবং তৎক্ষণাৎ অন্যায় কর্ম্ম হইতে বিরত হইয়া কুসুমের মত ভাল হইতে সংকল্প করে।

এইরূপে লক্ষ্মী ক্রমে যথার্থই লক্ষ্মী হইয়া দাঁড়াইল।

*　　*　　*　　*

ইহার পর কত দিন চলিয়া গিয়াছে, লক্ষ্মীর এখন বিবাহ হইয়া গিয়াছে। কত দিন পরে লক্ষ্মী শ্বশুরালয় হইতে পিত্রালয়ে আসিয়াছে। লক্ষ্মী এখন সকলকে ভালবাসিতে শিখিয়াছে, লক্ষ্মীকেও এখন সকলে ভালবাসে। লক্ষ্মীর আগেকার যত সমবয়সী সকলেই তাহাকে দেখিতে আসিয়াছে, কেবল কুসুম আসে নাই। কুসুম কোথায়? কুসুম বুঝি এ পৃথিবীর মেয়ে নয়, স্বর্গে ফুটিতে গিয়াছে!

লক্ষ্মী বিকালে সেই ছেলেবেলার বাগানটিতে আসিল, বাগানের চারিদিকে বিষণ্ণ মনে ঘুরিয়া ঘুরিয়া চাহিয়া দেখিল। ছেলেবেলা যেখানে যে গাছগুলি দেখিয়াছিল, সকলই তেমনই

দেখিল, ছেলেবেলা যেখানে যাহার সহিত যেমন করিয়া খেলা করিয়াছিল, সকলেরই চিহ্ন যেন দেখিতে পাইল। লক্ষ্মী আস্তে আস্তে সেই পুকুর ধারের কেয়াগাছটির কাছে আসিয়া দাঁড়াইল,—এই খানেই তাহার জীবনের প্রথম শিক্ষা। এই পুকুরধারে কত যত্ন করিয়া কুসুম তাহার আহত হস্তে জল দিয়া দিয়াছিল, কিরূপ প্রতিশোধ দিয়া লক্ষ্মীকে সে ভাল করিয়াছে! এই সমস্ত মনে করিয়া অশ্রুজলে লক্ষ্মীর বুক ভাসিয়া গেল। লক্ষ্মী মনে মনে বলিল "কুসুম কোথায় তুমি! তোমাকে আর পৃথিবীতে দেখিতে পাইলাম না, তুমি এখন স্বর্গের দেবী;—কিন্তু লক্ষ্মীর হৃদয়ে তুমি চিরকালই ফুটিয়া থাকিবে।"

শিশু হরি।

গিয়েছে বেলা বয়ে,
এসেছে সন্ধ্যা হয়ে,
শ্রীহরি মা মা করি—ছুটিয়ে আসে।
দেখে মা নাহি ঘরে,
খুঁজিয়ে গৃহ ফিরে,
আকুল আঁখি নীরে কপোল ভাসে।

মেঘেতে ভাসে চাঁদ,—
জ্যোৎস্নার নাহি বাঁধ,
তারকা ফুটে ওঠে গগনময়,
'এই ত চাঁদা মামা,
কোথায় মা গো আমা ?
কে দিবে টিপ ভালে—এই সময়'!

আকাশে আঁখি তুলে
শ্রীহরি ফুলে ফুলে
কেবলি কাঁদে আর—কাতরে ডাকে।
মা আসি হেন কালে
মুখ্‌খানি চুমি বলে
"ভেবে যে সারা হই দেরির পাকে।"

কাঁদিয়ে গলা ধরি,
হাসিয়ে বলে হরি,
'মাগো মা সারা দিন, কোথায় ছিলি ?
এনেছি দেখ ফুল,
পরিয়ে দেব চুল !
যাব না কোথা আর—তোরে মা ফেলি।"

———•———

সাররত্ন।

সংসারে যে এত ঈর্ষ্যা, দ্বেষ, নিষ্ঠুরতা প্রভৃতি দেখা যায়, তাহার কারণ কি? ভালবাসার অভাবই তাহার প্রকৃত কারণ। আমরা যাহাদিগকে ভালবাসি, তাহাদিগের প্রতি নিষ্ঠুর আচরণ করিতে আমাদের প্রাণে ব্যথা লাগে, তাহাদিগের মঙ্গল কামনা করিয়া, তাহাদিগের অভাব দূর করিয়া আমরা নিজে সন্তোষ অনুভব করি। আমরা যাহাদিগকে ভালবাসি না, তাহাদিগের সুখে আমাদের ঈর্ষার উদয় হয়। সুতরাং প্রেমই সংসারে সুখ সন্তোষের মূল। যাঁহাদের প্রেম যত উদার, যত বিস্তৃত, যাঁহারা যত অন্যের সুখে সুখী, যত পরোপকারী, তাঁহারা তত মহৎ লোক। অনেক সময় আমরা আলস্য-স্পৃহাকে সন্তোষ জ্ঞানে হৃদয়ে পোষণ করিয়া নিজের অবনত অবস্থার উন্নতিতে নিশ্চেষ্ট হই। কিন্তু এই ভ্রান্ত বিশ্বাস নিতান্তই অনর্থের মূল। বস্তুতঃ আলস্য আমাদিগকে যথার্থ সন্তোষ দিতে পারে না, কেবল আমাদিগের জড়ভাব বৃদ্ধি করে মাত্র। প্রকৃত পক্ষে অন্যের সুখের অবস্থাকে ঈর্ষা করাই যথার্থ অসন্তোষ, কিন্তু নিজের উন্নতির জন্য মানুষের যে উদ্যম—সে উদ্যমের মধ্যেও যথার্থ সন্তোষ নিহিত।

যদি সুখী হইতে চাহ ত আলস্য পরিত্যাগ কর, কিন্তু সংসারের সাররত্ন প্রেম ও সন্তোষে হৃদয় উজ্জ্বল করিয়া রাখ।

একদিন ভাগ্যদেবী মনুষ্যের ভাগ্য মাপিতেছেন—এবং আপনার ক্ষমতায় মনে মনে গর্ব্ব অনুভব করিতেছেন, এমন সময় গোলাপদলের পরিচ্ছদ পরিয়া প্রজাপতিতে চড়িয়া একটী ক্ষুদ্র পরী সেইখানে আসিয়া উপস্থিত হইল। তাহাকে দেখিয়া ভাগ্যদেবী সহাস্য-মুখে জিজ্ঞাসা করিলেন—"কোথা হইতে আসিতেছ ? দেখিয়া ত বোধ হইতেছে পৃথিবী হইতে। সেখানকার খবর কি ?"

পরী বলিল "খবর বড় ভাল নহে—লোকে কেবল সেখানে নিজের ভাগ্যের আর তোমার নিন্দা করিতেছে। বাস্তবিক তোমার ভাণ্ডারে ধন, মান, যশ প্রভৃতি মানবের প্রার্থনীয় বস্তুর কিছুরই অভাব নাই—তুমি ইচ্ছা করিলেই লোককে সুখী করিতে পার, তবে কেন কর না ? আমি যদি তোমার কাজে থাকিতাম—তাহা হইলে কেহ দুঃখ পাইত না।"

ভাগ্যদেবী এই নিন্দায় ক্রুদ্ধ হইয়া বলিলেন—"বেশ ত তুমি কিছু দিন আমার কাজ করিয়া দেখ না, তখন বুঝিবে, মানুষকে সুখী করা কেমন সহজ।"

এই বলিয়া ভাগ্যদেবী তাঁহার ধন-ভাণ্ডারের চাবি পরীর হাতে দিলেন।

পরী ভাগ্যদেবীর ভাণ্ডার খুলিয়া তাহার শোভায় মোহিত হইয়া গেল। ভাণ্ডারটি তিন ভাগে বিভক্ত। প্রথম কক্ষটি ধন-ভাণ্ডার—অগণ্য হীরা, মুক্তা, মণি, কাঞ্চনের জ্যোতিতে কক্ষ

আলোকিত এই আলোক-সাগরে পড়িয়া পরীর চক্ষু যেন ঝল-সিয়া যাইতে লাগিল।

দ্বিতীয় কক্ষটি মান, যশ, বিদ্যা, বুদ্ধির ভাণ্ডার, ইহার দিগন্ত-ব্যাপী সৌরভে পরীর হৃদয় মুগ্ধ হইয়া পড়িল।

তৃতীয় কক্ষে বাহ্যমোহকর বস্তু কিছুই ছিল না। এই কক্ষে প্রবেশ করিবামাত্র একটি অপূর্ব্ব শান্তিতে তাহার মনপ্রাণ পরি-পূর্ণ হইয়া উঠিল। এই কক্ষটি ভাগ্যদেবীর সাররত্নের ভাণ্ডার,—সন্তোষ ও প্রেম এই দুইটি মাত্র রত্ন এখানে রক্ষিত।

এই সকল ধনরত্ন দেখিয়া পরীর হৃদয় আহ্লাদে স্ফীত হইয়া উঠিল। এই দুর্লভ, অপূর্ব্ব দ্রব্য থাকিতে ভাগ্যদেবী কাহাকেও সুখী করিতে পারেন না, ইহা তাহার অত্যন্ত আশ্চর্য্য বলিয়া মনে হইতে লাগিল।

এই সকল ধন রত্ন দ্বারা পরী যে পৃথিবীর দুঃখ দূর করিতে সমর্থ হইবে, তাহাতে আর তাহার সন্দেহ মাত্র রহিল না।

আশাপূর্ণ হৃদয়ে সে পৃথিবীতে নামিয়া প্রথমেই একটি মাঠের ধারে একখানি ভগ্ন কুটীরের প্রতি দৃষ্টিপাত করিল। দেখিল,—কুটীরে একজন কৃষকপত্নী ক্ষুধিত সন্তানের দিকে চাহিয়া কাঁদিতেছে, আর চাষা নিকটেই ক্ষেত্রে কোদাল পাড়িতেছে, তাহার এমন সঙ্গতি নাই যে একখানি লাঙ্গলও কিনিয়া কার্য্যের একটু সুসার করে। তাহাদের দুঃখ দেখিয়া দয়ার্দ্র হৃদয়ে চাষার নিকটে আসিয়া পরী তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল—"তুমি কি কি, চাও?"

কৃষক তাহার নিকট কিঞ্চিৎ অর্থ প্রার্থনা করিল, এবং প্রার্থনা পূর্ণ হইলে মহা সুখী হইয়া কুটীরে গমন করিল।

পরী মনে মনে ভাবিল, "এই ত ভাগ্যদেবী যাহা পারেন নাই, আমি তাহা পারিলাম, আমার দানে কৃষক কতদূর সুখী হইয়াছে। আচ্ছা ইহার যেন ধনের অভাব ছিল, কিন্তু যাহার ধনের অভাব নাই, সে না জানি কিসের কাঙ্গাল।" পরী কৌতূহল-পরবশ হইয়া একজন ধনীর গৃহে আসিয়া দেখিল, ধনী মনে মনে মহা অসুখী। তাহার ধন আছে বটে কিন্তু মান নাই। পরী দয়ার্দ্র হইয়া তাহাকে মান দান করিল। মান পাইয়া তাহাকে সুখী হইতে দেখিয়া পরী তখন ভাবিতে লাগিল—"আচ্ছা এক-জন ধনের কাঙ্গাল—একজন মানের কাঙ্গাল, এ দুইই যাহার আছে, তাহার কি দুঃখ?" এই ভাবিয়া পরী এক রাজগৃহে আসিয়া দেখিল, রাজার ধন মানের কিছুরই অভাব নাই, তথাপি তিনি অসুখী! নিষ্ঠুর রাজা প্রজাদিগের উপর সর্ব্বদাই পীড়ন করেন, অথচ তিনি চান সকলেই তাঁহার বশীভূত হইবে। পরীর কৃপায় তাঁহার ইচ্ছাও পূর্ণ হইল—বিদ্রোহী প্রজারাও তাঁহার অনুগত হইয়া পড়িল। রাজাকে সুখী করিয়া পরী গর্ব্বিত হৃদয়ে ভাগ্যদেবীকে এই শুভ সংবাদ দিতে গমন করিল। পথের মধ্যে তাহার মনে হইল, "আচ্ছা সেই কৃষক—যাহাকে ধন দিয়া আমি সুখী করিয়াছি, সে কেমন সুখে আছে একবার দেখিয়া যাই"।

কিন্তু চাষার কাছে আসিয়া পরী দেখিল, চাষা ধনী হইয়াছে

বটে—কিন্তু এখনও সে সুখী হয় নাই, তাহার ধন-তৃষ্ণা আরও বাড়িয়াছে। পরী তখন তাহাকে আরও ধন প্রদান করিল, কিন্তু তাহার ধনতৃষ্ণা তাহাতেও মিটিল না। তখন পরী হতাশ হইয়া ভাবিল—"একজনকে সুখী করিতে নাই পারিলাম, আর দুই জনকে ত করিয়াছি"।

কিন্তু তাহাদের নিকট আসিয়া দেখিল, হায়! তাহার সমস্ত দানই ব্যর্থ হইয়াছে—কেহই সুখী হয় নাই। আশা কাহাকেও সহজে ছাড়ে না। অতঃপর পরী ভাবিল—"আমি আর একবার চেষ্টা করিব, তৃতীয় কক্ষের কোন জিনিস এ পর্য্যন্ত কাহাকেও দিই নাই, সেই সার ধন দিয়া ইহাদের দুঃখ দূর করিব"। এই ভাবিয়া পরী তৃতীয় কক্ষের দুইটী রত্ন হাতে লইয়া প্রথমে চাষার নিকট, পরে ধনীর নিকট আসিয়া তাহাদের প্রার্থিত ধনের পরিবর্ত্তে সন্তোষ-ধন দিতে চাহিল। কিন্তু উভয়ের কেহই তাহা লইতে সম্মত হইল না। তখন পরী রাজগৃহে গিয়া উপস্থিত হইল। যদিও পরীর করুণায় এখন প্রজারা রাজার বশীভূত, কিন্তু তথাপি নিষ্ঠুর অত্যাচারী রাজা মনে মনে সদাই সশঙ্কিত। পরী তাঁহাকে প্রেম-রত্ন দেখাইয়া বলিল "রাজা! এই রত্ন গ্রহণ কর—ইহা গ্রহণ করিলে তোমার অসুখ বিন্দুমাত্র থাকিবে না—"

রাজা সে রত্নের সারত্ব কিছুই অনুভব করিতে পারিলেন না—সুতরাং পরীর দান অগ্রাহ্য করিলেন। পরী তখন হতাশ হইয়া ক্ষুণ্ণচিত্তে ভাগ্যদেবীর নিকট যাত্রা করিল। যাইতে যাইতে দেখিল—একজন গৃহস্থ সমস্ত দিনের পরিশ্রমের পর স্ত্রী, পুত্র, কন্যাকে

লইয়া আহ্লাদ করিতেছে এবং তাহার এই সুখের জন্য মনে মনে ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দিতেছে। পরী তাহার নিকট গিয়া তাহার অমূল্য রত্নের কিছু কিছু ভাগ দিতে চাহিল; গৃহস্থ অন্যের ন্যায় তাহা লইতে অস্বীকৃত না হইয়া কৃতজ্ঞচিত্তে গ্রহণ করিল। পরী তখন আবার তাহার গম্য পথে যাত্রা করিল—তাহার দানে গৃহস্থ প্রকৃত সুখী হয় কি না, তাহা দেখিবার জন্য সে আর অপেক্ষা করিল না। কিছুতে যে কাহাকেও সুখী করা যায়—এ আশা আর তখন তাহার ছিল না। পরী ভাগ্যদেবীর নিকট পৌছিয়া বলিল—"মানুষকে সুখী করা কত কঠিন, তাহা আমি বুঝিয়াছি—ইহা না বুঝিয়াই আগে আমি তোমাকে নিন্দা করিয়াছিলাম, সে জন্য আমাকে ক্ষমা কর। রাজা, ধনী, কৃষক ও গৃহস্থ,—এই চারি জনের একজনকেও যখন সুখী করিতে পারিলাম না, তখন সমস্ত জগৎ সুখী করিব কি করিয়া?" পরীর এই কথায় ভাগ্যদেবী তাহার দুঃখে দুঃখিত হইয়া বলিলেন "তুমি সকলকে সুখী করিতে পার নাই সত্য কিন্তু কেহই যে তোমার দানে সুখী হয় নাই—তাহা নহে। রাজা, ধনী, চাষা, প্রথমে তোমার দানে সুখী হইয়াছিল কিন্তু সে সুখ প্রকৃত সুখ নহে, তাই তাহা স্থায়ী হইল না। কিন্তু ঐ দেখ একজনকে তুমি প্রকৃত সুখ দিয়াছ। তোমার অনুগ্রহে ঐ গৃহস্থের ন্যায় জগতে আর কেহই সুখী নহে।"

—:•:—

বোনের ভালবাসা।

ছোট বোনের প্রতি বড় বোন।

আমার খুকুরাণী, সোণামণি
আয় ত কোলে ভাই,
বুকে থুয়ে মুখখানি তোর
সদাই দেখতে চাই।
অমন মধুর হাসি, মধুর মুখে
কোথায় আছে কার?
চাঁদা মামা, ঢেলে গেছে
সুধা যত তার।
অমন নরম নরম বাধো বাধো
আধো-কথা শুনি—
কোথা হ'তে শিখে এলি
বোনটী বল শুনি!
তোরে দেখলে পরে, হরষ ভরে
হৃদয় ভেসে যায়,
রাখি তোরে বুকে ক'রে
আয় রে খুকু আয়।

স্বাস্থ্য।

জ্ঞান ধর্ম্মের উন্নতি সহকারে প্রকৃত মনুষ্যত্ব লাভ করাই যে মনুষ্য জীবনের উদ্দেশ্য, তাহা তোমরা বুঝিয়াছ। যেমন আহার, ব্যায়াম প্রভৃতি দ্বারা শারীরিক স্বাস্থ্য লাভ হয়, সেইরূপ জ্ঞান ধর্ম্মে মানসিক, আধ্যাত্মিক স্বাস্থ্য বিকশিত হয়। বিদ্যানুশীলন আমাদের জ্ঞান-ধর্ম্ম লাভের বিশেষ সহায়তা করে।

যদিও আমাদের দেশে অধুনা ধন উপার্জ্জনের জন্যই সাধারণতঃ বিদ্যার আদর, পিতামাতা বালকদিগকে অতি শিশুকাল হইতে বলিয়া থাকেন—"লেখা পড়া করে যেই, গাড়ী ঘোড়া চড়ে সেই"—কিন্তু বস্তুতঃ কেবল ধন উপার্জ্জন নহে, বিদ্যা শিক্ষা দ্বারা জীবনের গুরুতর উদ্দেশ্য সকলও সাধিত হয়। বিদ্যায় আমাদের অজ্ঞানতার লাঘব হয়, আমাদের জীবনের উদ্দেশ্য সকলও বহুপরিমাণে আমরা বুঝিতে সক্ষম হই—এবং আমাদের কর্ত্তব্য পথও আমাদের নিকট উদ্ঘাটিত হয়। সুতরাং সকল বালকেরই বিদ্যা শিক্ষার প্রতি বিশেষ মনোযোগী হওয়া কর্ত্তব্য। কিন্তু লেখা পড়া করিতে গিয়া শরীরের স্বাস্থ্যের প্রতি তোমাদের যেন আস্থার অভাব না হয়। যেমন খাদ্যাদি পরিপাকের যন্ত্র পাকস্থলী, সেইরূপ বিদ্যা পরিপাকের অর্থাৎ বুদ্ধিবৃত্তি চালনার যন্ত্র মস্তিষ্ক। স্বাস্থ্যের হানি হইলে মস্তিষ্ক হীনবল হইয়া যায়, সুতরাং সঙ্গে সঙ্গে বিদ্যা শিক্ষারও হানি হয়। যদিই বা স্বাস্থ্যের নিয়ম ভঙ্গ করিয়া হাতে হাতে তখনি ফল প্রাপ্ত না হওয়া যায় কিন্তু ভবিষ্যতে তাহার ফলভোগ অনিবার্য্য। এই

কারণে এদেশের বিশ্ববিদ্যালয়ের অনেক ভাল ভাল ছাত্রকে দুর্ব্বল ও রুগ্নকায় দেখা যায়।

"ধন, মান, বিদ্যা ও পারিবারিক সুখ সত্ত্বেও ভগ্নস্বাস্থ্য ব্যক্তির সুখ নাই, আর একবার স্বাস্থ্যভগ্ন হইলে পূর্ব্ববৎ তাহা ফিরিয়া পাওয়াও সহজ নহে।

পূর্ব্বতন ঋষিগণ স্বাস্থ্য রক্ষার নিয়ম উত্তমরূপে জানিতেন এবং তাহা পালন করিয়া চলিতেন, সেই জন্যই তাঁহারা দীর্ঘায়ু লাভ করিয়া জ্ঞানধর্ম্মে উন্নত হইয়া জন সাধারণের উপকারে জীবন যাপন করিতে পারিতেন।"

কৃতবিদ্য বাঙ্গালীদিগের মধ্যেও যে অধুনা মঙ্গল কার্য্যে উদ্যম ও উৎসাহের অভাব দেখা যায়, শারীরিক পূর্ণ স্বাস্থ্যের অভাব তাহার একটী কারণ। শরীরের সহিত মনের এমনি ঘনিষ্ট সম্বন্ধ যে, শরীরের স্ফূর্ত্তি না হইলে মানসিক শক্তিরও স্ফূর্ত্তি হইতে পারে না। এই সকল কারণে বিদ্যা শিক্ষার ন্যায় স্বাস্থ্যরক্ষার প্রতিও বাল্যকাল হইতেই সকলের বিশেষ মনোযোগী হওয়া কর্ত্তব্য। মানসিক স্বাস্থ্য কিরূপে রক্ষা হয় অর্থাৎ মনুষ্য জীবনের উদ্দেশ্য কিরূপে সাধিত হয়, তাহা পুস্তকের আরম্ভেই তোমাদিগকে বলিয়াছি—এখন এইখানে শারীরিক স্বাস্থ্য রক্ষা সম্বন্ধে তোমাদিগকে কিছু বলিব।

বিশুদ্ধ জল, বাতাস, পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা, পুষ্টিকর আহার, ব্যায়াম স্বাস্থ্যের পক্ষে বিশেষ অনুকূল।

বিশুদ্ধ জলবাতাস।

কলিকাতায় জলের কল হওয়া অবধি এখানে পরিষ্কার জলের অভাব নাই, কিন্তু অনেক গ্রাম জলের দোষে পীড়ার আকর হইতেছে। এরূপ স্থলে গ্রামের যে সকল পুষ্করিণীর জল পান করা যায়, তাহাতে স্নানাদি করিয়া পানীয় জল কলুষিত করা উচিত নহে। এমন কি কাহারও একখানি কাপড় পর্য্যন্ত সে জলে যাহাতে ডুবান না হয়, তাহার প্রতি লক্ষ্য রাখা উচিত। এইরূপ যত্নরক্ষিত পুষ্করিণীর জল প্রথমে উষ্ণ করিয়া পরে ফিল্‌-টার করিয়া লইলে অনেক পরিমাণে তাহার দূষণীয়তা দূর হইতে পারে।

যাঁহাদের কলিকাতা হইতে ফিল্‌টার কিনিয়া লইয়া যাইবার সুবিধা নাই, তাঁহারা নিম্নলিখিত সহজ উপায়ে জল পরিষ্কার করিয়া লইতে পারেন। অর্দ্ধ হস্ত দূরে দূরে তিনটি মৃত্তিকা কলস উপর্য্যুপরি থাকিতে পারে—এইরূপ একটি কাষ্ঠের কুম্ভস্থাপন-মঞ্চ প্রস্তুত করাইয়া তাহার উপর একে একে তিনটি কলসী রাখিবে। উপরের দুইটীর তলদেশে অল্প ছিদ্র করিয়া সর্ব্বোপ-রিস্থটিতে বালি এবং তন্নিম্নস্থটিতে কয়লা রাখিয়া প্রথমটি উষ্ণজল দ্বারা পূর্ণ করিবে। ক্রমে সেই জল বালিপূর্ণ কলসের মধ্য দিয়া কয়লাপূর্ণ দ্বিতীয় কলসে সঞ্চিত হইয়া তন্মধ্য দিয়া আবার নিম্নের কলসীতে বিশুদ্ধ হইয়া পড়িবে। তখন তাহা কুজা বা কলসীতে রাখিয়া পান করিবে।

প্রতি সপ্তাহে কলসীর পুরাতন বালি ও কয়লা ফেলিয়া দিয়া তাহার মধ্যে পুনরায় যেন নূতন বালি ও কয়লা রাখা হয়।

এইটুকু পরিশ্রম স্বীকার করিয়া যাঁহারা পানের জল বিশুদ্ধ করিয়া লইতে না চাহেন, তাঁহাদিগকে স্বাস্থ্যের উপদেশ দেওয়া বৃথা।

পল্লীগ্রামে বিশুদ্ধ জলের অভাব হউক—বিশুদ্ধ বায়ুর সাধারণতঃ অভাব নাই, এ হিসাবে পল্লীগ্রামবাসীগণ কলিকাতাবাসী হইতে সৌভাগ্যবান।

কলিকাতায় অধিকাংশ বাঙ্গালীর বাস গলি ঘুঁজির মধ্যে; সুতরাং স্বাস্থ্যের জন্য সকল বালকেরই এরূপ স্থলে অন্ততঃ একবার করিয়া মুক্ত প্রান্তরে বিশুদ্ধ বায়ুসেবনের নিমিত্ত গমন করা উচিত। মুক্ত বিশুদ্ধ বায়ুতে শরীর কিরূপ স্ফূর্ত্তি লাভ করে, তাহা কলিকাতা হইতে অল্প দিনের জন্যও যাঁহারা পল্লিগ্রাম বা পশ্চিম প্রভৃতি দেশে গিয়াছেন—তাঁহারাই জানেন।

এইখানে একটি কথা; বালিকাদিগকে ময়দান প্রভৃতি কোন মুক্ত স্থানে পাঠান প্রায়ই বাঙ্গালীর সুবিধা হয় না, এরূপ স্থলে সকালে সন্ধ্যায় যাহাতে তাহারা অন্ততঃ ছাতে ভ্রমণ করিয়া বেড়ায়, ইহার প্রতি দৃষ্টি রাখিতে মাতৃগণ যেন না ভুলেন।

আর একটি কথা—আজি কালি কি গ্রামে, কি সহরে, সর্ব্বত্রই কেরোসিন তৈলের দীপ ব্যবহৃত হইয়া থাকে, কিন্তু যেরূপ কেরোসিন দীপ হইতে অনর্গল ধূম নির্গত হইয়া গৃহ দুর্গন্ধময় ও

শীঘ্র উত্তপ্ত করিয়া তুলে, সেরূপ নিকৃষ্ট দীপ গৃহে প্রজ্বলিত করা স্বাস্থ্যের পক্ষে নিতান্ত ক্ষতিজনক।

কেরোসিন দীপ উৎকৃষ্ট হইলেও বদ্ধ-গৃহে উহা ব্যবহার করা উচিত নহে; কারণ উৎকৃষ্ট দীপ হইতেও অল্প পরিমাণে ধূম নির্গত হয়, এবং অন্যান্য তৈল অপেক্ষা কেরোসিন তৈলের দীপ সমুদ্দীপ্ত বলিয়া এই দীপ্তির প্রভাবে শীঘ্রই গৃহের বাতাস উষ্ণ হইয়া উঠে। এই সকল কারণে কেরোসিন দীপের সম্মুখে বসিয়া পাঠ করা অপেক্ষা পাঠের সময় মোমবাতি কিম্বা দুইটি পলিতা বিশিষ্ট সরিষা বা নারিকেল তৈলের দীপ ব্যবহার করাই ভাল এবং শয়ন কক্ষে সমস্ত রাত্রি কেরোসিন জ্বালাইয়া রাখাও উচিত নহে।

পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা।

পরিষ্কার জল বাতাস পাওয়া সর্ব্বদা আমাদের আয়ত্তাধীন নহে, কিন্তু নিজের দেহ এবং নিজের ঘর দ্বার বস্ত্রাদি পরিষ্কার রাখা সম্পূর্ণই আমাদের নিজের উপর নির্ভর করে। কিন্তু এ সম্বন্ধে অনেক বিষয়ে আমাদের পরিষ্কার ভাবের প্রতি বিশেষ লক্ষ্য থাকিলেও কতক বিষয়ে লক্ষ্যের অভাব দেখা যায়। যেমন আমরা প্রতিদিন স্নান করি বটে, কিন্তু তৈল মাখিবার পর উত্তমরূপে অঙ্গ মার্জ্জনা করি না। প্রতিদিন আমরা জলকাচা বস্ত্র পরি বটে, কিন্তু ময়লা কাপড় পরিতে, ময়লা বিছানায় শুইতে আমরা কষ্ট অনুভব করি না। দুই বেলা আমাদের গৃহে ঝাঁট পড়ে সত্য কিন্তু তথাপি আমাদের গৃহ ঠিক পরিষ্কার নহে। একটা ভাত ঘরে পড়িলে আমাদের গৃহের ছাল উঠিয়া যায়, কিন্তু অনেক সময় ঘরের মধ্যে থু থু কফ ফেলিতে আমাদের আপত্তি হয় না। প্রদীপের তেলে তেলে গৃহের কোন কোন স্থল একেবারে আটা হইয়া যায়, জিনিস পত্র এমন অসজ্জিতভাবে গৃহের যেখানে সেখানে ফেলা ছড়া থাকে যে, ঘরগুলা অনেক সময় আস্তাকুঁড়ের দশা প্রাপ্ত হয়।

এই সকল বিষয়ে আমাদের পরিষ্কারভাবের যে অভাব, তাহার প্রতি আমাদের দৃষ্টি রাখা আবশ্যক।

তেলমাখা শরীরের পক্ষে উপকারক কিন্তু তেল মাখিয়া

সাবান যেমন দ্বারা উত্তমরূপে অঙ্গ মার্জ্জনা করা স্বাস্থ্যের জন্য অতীব আবশ্যক।

ধোপার অসুবিধার জন্য আমাদের কাপড় অনেক সময়ে ময়লা না হইয়া উপায় নাই, কিন্তু এরূপ অবস্থায় সাজিমাটি দিয়া ঘরে সহজেই বস্ত্রাদি পরিষ্কার করিয়া লওয়া যাইতে পারে। ময়লার প্রতি আন্তরিক বিতৃষ্ণার উদ্রেক হইলে অবশ্যই এই উপায় অবলম্বিত হইবে সন্দেহ নাই।

ঘর দ্বার কেবল সম্মার্জ্জনী-মার্জ্জন ব্যতীত যাহাতে পরিপাটি-রূপে সজ্জিত থাকে, তাহার দিকেও আমাদের লক্ষ্য রাখা আবশ্যক। অতি অল্প পরিশ্রমেই ইহা সম্পন্ন হইতে পারে। জিনিস-পত্রগুলি যথা স্থানে সন্নিবেশিত ও ঘরের কোলঙ্গায় বা টেবিলে দুই একটি ফুলদানীর উপর দুটি চারটি ফুল রাখিলে ঘরটি কেমন পরিষ্কার ও নয়ন-প্রীতিকর হয়। বারান্দায়, উঠানে অল্প স্বল্প ফুলের টব সাজাইয়া রাখিলে কেমন সুন্দর দেখিতে হয়। এইরূপ গৃহ সজ্জায় আমাদের নয়ন ও মনের পরিতৃপ্তির সঙ্গে সঙ্গে সৌন্দর্য্য-জ্ঞান এবং সুরুচিরও উৎকর্ষতা লাভ হয়। বলা বাহুল্য সৌন্দর্য্য-জ্ঞান আমাদের যত বাড়িবে, পরিষ্কার ভাবের প্রতিও তত আমাদের লক্ষ্য বাড়িবে। এখন যেরূপ ময়লার মধ্যে থাকিতে আমরা ময়লাই মনে করি না—তখন সেগুলি আমরা আপনা হইতে পরিত্যাগ করিব, এবং উক্তরূপ পরিচ্ছন্নতায় আমাদের শরীর ও মন উভয়েরই স্ফূর্ত্তি সাধন হইবে। সুতরাং সর্ব্বতোভাবে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকিবার দিকে আমাদের

সকলেরই—বিশেষতঃ আমাদের স্ত্রীলোকদিগের, বিশেষ লক্ষ্য রাখা উচিত। গৃহিণীগণ উক্তরূপ পরিষ্কৃতির এবং গৃহ পারিপাট্যের আবশ্যকতা বুঝিলেই তাহা সুচারুরূপে সাধিত হইবে।

খাদ্য।

কিরূপ আহার আমাদের স্বাস্থ্যের পক্ষে বিশেষ আবশ্যক, তাহা জানিতে হইলে খাদ্যের গুণাগুণ প্রথমে কিছু বুঝা আবশ্যক।

অধুনাতন বিজ্ঞানবিৎ-পণ্ডিতেরা চারি শ্রেণীতে সমস্ত ভক্ষ্য-দ্রব্যকে বিভক্ত করিয়া থাকেন,—যথা—

১। সত্ত্বকারী বা প্রাণকারী।

২। তৈল বা চর্ব্বি জাতীয়।

৩। শ্বেত সার।

৪। ধাতব।

সত্ত্বকারী বা প্রাণকারী পদার্থে সচরাচর চারিটি মৌলিক বা ভৌতিক পদার্থ দেখিতে পাওয়া যায়—যথা ক্ষারজান, অম্লজান, জলজান ও অঙ্গারজান। কখন কখনও উহাতে গন্ধক ও ফসফোরসও পাওয়া যায়। ময়দা, ডিম্ব, মাংস ও দুগ্ধ এই সমুদায়ের সারাংশ এই জাতীয় পদার্থ।

২। চর্ব্বি। ইহাতে তিনটি ভৌতিক পদার্থ পাওয়া যায়। অঙ্গারজান, জলজান ও অম্লজান। সকল প্রকার চর্ব্বি ও তৈল এই জাতীয় পদার্থ।

৩। শ্বেতসার। ইহাতেও তিনটি মৌলিক পদার্থ পাওয়া যায়। অঙ্গারজান, জলজান ও অম্লজান, কিন্তু চর্ব্বিজাতীয় পদার্থে জলজানের ভাগ অধিক। আমাদের প্রায় সকল প্রকার

খাদ্য দ্রব্যের মধ্যে শ্বেতসার অত্যধিক পরিমাণে পাওয়া যায়। গঁদ, শর্করা, আরারুট, তণ্ডুল, ময়দা, আলু ইত্যাদিতে অত্যধিক পরিমাণে শ্বেতসার আছে।

৪। ধাতব পদার্থ ও জল। এই দুই পদার্থ সকল ভক্ষ্য দ্রব্যের মধ্যেই ন্যূনাধিক পরিমাণে পাওয়া যায়।

উপরি উক্ত চারি বিভাগের মধ্যে কোন একটি দ্রব্য অধিক কাল পর্য্যন্ত আহার করিয়া প্রাণধারণ করিতে পারা যায় না।

প্রকৃত জীবন ধারণোপযোগী আহারে এই চারি জাতীয় পদার্থ মিশ্রিত হওয়া আবশ্যক। কিন্তু কোন সত্বকারী পদার্থ যদি সহজে জীর্ণ হয়, তাহা হইলে অন্যজাতীয় পদার্থের সাহায্য ব্যতীতও ইহা জীবন ধারণোপযোগী হইতে পারে।

কারণ সত্বকারী পদার্থে যে চারিটি মৌলিক পদার্থ দেখা যায়, ঐ চারিটি মৌলিক পদার্থে মনুষ্য দেহও গঠিত হইয়াছে, সুতরাং মনুষ্য দেহ ও সত্বকারী পদার্থের রাসায়নিক সংঘটন একই। এতদ্ব্যতীত ধাতব পদার্থ ও জলও আমাদের দেহে পাওয়া যায়।

প্রতি মুহূর্ত্তেই আমাদের শরীর হইতে ঘর্ম্ম প্রভৃতির নিঃস্র-বণের সঙ্গে যে এক প্রকার ক্ষার জাতীয় পদার্থ নির্গত হইতেছে, আহার কর বা না কর ইহা নির্গমনের বিরাম নাই। এই নিঃস্রবণ শরীরাভ্যন্তরিক সত্বকারী পদার্থের রূপান্তর মাত্র। এই কারণে সত্বকারী পদার্থ দ্বারা শরীরের ক্ষতি সর্ব্বাপেক্ষা অধিক পূরণ হইয়া থাকে। অঙ্গারাম্ল ও জল যাহা সর্ব্বদা ক্ষয়প্রাপ্ত-শরীর-জাত

দ্রব্য মধ্যে পাওয়া যায়, তাহাও সত্ত্বকারী পদার্থের অম্লজান ও অঙ্গারজান হইতে উদ্ভূত হইতে পারে।

তোমরা এখন বুঝিতে পারিয়াছ সত্ত্বকারী পদার্থ চারি প্রকার ভক্ষ দ্রব্যের মধ্যে সর্ব্ব প্রধান, এবং কোন কোন অবস্থায় অন্য শ্রেণীর সাহায্য ব্যতীতও প্রাণধারণোপযোগী হইতে পারে, কিন্তু ইহা সত্বেও সত্ত্বাকারী পদার্থ অসুবিধাজনক ও অপরিমিত খাদ্য। একটি উদাহরণ দিয়া বুঝান যাউক। ডিম্বসার একপ্রকার প্রধান সত্ত্বকারী পদার্থ। ইহার শতভাগের মধ্যে ৫৩ ভাগ অঙ্গারজান ও ১৫ ভাগ ক্ষারজান পাওয়া যায়। যদি কোন ব্যক্তিকে কেবল ডিম্বের শ্বেত ভাগ আহার দেওয়া যায়, তাহা হইলে মোটামুটি ধরিতে গেলে সে ব্যক্তি প্রত্যেক ক্ষারজান ভাগের সহিত সার্দ্ধ তিন ভাগ অঙ্গারজান আহার করিবে। কিন্তু ইহা প্রত্যক্ষ দেখা যায় যে, একজন সুস্থকায় পুষ্ট মনুষ্য যে নিজ ভার ও স্বাভাবিক উত্তাপ রক্ষণের উপযুক্ত ও মধ্যবিৎ রকম ব্যায়াম করিয়া থাকে, তাহার দেহ হইতে চারি সহস্র গ্রেণ অঙ্গার ও তিন শত গ্রেণ ক্ষারজান নির্গত হয় অর্থাৎ ক্ষারজানের তের গুণ অঙ্গারজান নির্গত হয়। অতএব যদি কোন ডিম্বসার হইতে তাহাকে ৪০০০ গ্রেণ অঙ্গার লইতে হয়, তাহা হইলে ঐ পদার্থ ৭৫৪৭ গ্রেণ আহার করিতে হয়। কিন্তু ৭৫৪৭ গ্রেণ ডিম্বসারে ১১৩২ গ্রেণ ক্ষারজান আছে অর্থাৎ যত ক্ষারজানের আবশ্যক, তাহার প্রায় চারিগুণ অনর্থক আহার করিতে হয়।

স্বাস্থ্যরক্ষার একটি প্রধান নিয়ম এই যে, আহার বলবর্দ্ধক ও

শরীর রক্ষার উপযোগী হইবে, অথচ পরিমাণে অধিক হইবে না। কিন্তু সত্ত্বকারী পদার্থ দ্বারা যদি জীবন ধারণ করিতে হয়, তাহা হইলে এই নিয়ম রক্ষা হয় না, এবং তজ্জন্য অল্প সময়ের মধ্যেই স্বাস্থ্য ভঙ্গ হইয়া শরীর দুর্ব্বল হইয়া পড়ে। এই বিশেষ কারণে মিশ্র আহার অর্থাৎ সত্ত্বকারী ও তৈল বা শ্বেতসার জাতীয় পদার্থ মিশ্রিত আহার মনুষ্যের পক্ষে বিশেষ উপযোগী ও স্বাস্থ্যকর। উক্ত তিন প্রকার খাদ্যের মধ্যেই ধাতব পদার্থ ও জল পাওয়া যায়।*

শরীরের পুষ্টির জন্য যাহা আবশ্যক, তাহা মিশ্র আহারেই পাওয়া যায়, ইহা তোমরা বুঝিলে; কখন কিরূপ আহার করিলে এই উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইতে পারে তাহা এইবার দেখা যাউক।

ডাক্তারেরা বলেন, শিশুকাল অতিক্রম করিবার পর সাধারণতঃ দিন রাত্রির মধ্যে নিয়মিত চারিবারের অধিক না খাওয়াই ভাল। চারি বারের দুইবার পূর্ণ আহার—দুই বার লঘু আহার।

প্রত্যূষে উঠিয়া মুখ প্রক্ষালনের পর কিছু লঘু আহার করিয়া বেড়াইতে যাইবে; কিম্বা যদি তাহাতে অসুবিধা হয়—ত বেড়াইয়া আসিয়া এই আহার করিবে।

---

* উপরে খাদ্য সম্বন্ধে যাহা বলা হইল, তাহা "ভারতী" পত্রিকায় প্রকাশিত ডাক্তার ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত "ভক্ষ্য দ্রব্য কয় প্রকার" প্রবন্ধ হইতে গৃহীত।

ইয়োরোপীয়দিগের হিন্দুদিগের ন্যায় আহারের বিচার নাই, সুতরাং ইংরাজ ডাক্তারেরা এ সময়ে সাধারণতঃ মুরগীর কাঁচা ডিম বা অর্দ্ধসিদ্ধ ডিম দু একটি, দুই এক টুকরা মাখন মিশ্রিত পাঁউরুটি, এবং ইহার সহিত চা, কোকো, কিম্বা দুগ্ধ পানের ব্যবস্থা দিয়া থাকেন। কেননা ডিম্ব একদিকে লঘূ—অন্যদিকে পুষ্টিকর খাদ্য।

আমাদের দেশের অনেকের ধারণা আছে, কাঁচা ডিম কাঁচা মাংসের মত অখাদ্য। কিন্তু বস্তুতঃ কাঁচা ডিম বিস্বাদ নহে এবং সিদ্ধ ডিমের অপেক্ষাও শীঘ্র পরিপাক হয়।

তবে আমাদের দেশের পক্ষে মুরগীর ডিম অখাদ্যের মধ্যে পরিগণিত সুতরাং এদেশের বালকগণের পক্ষে অল্প পরিমাণে ছোলাভিজা, মোহনভোগ ও দুগ্ধ কিম্বা দুগ্ধ-মিশ্রিত আর কিছু—যেমন কোকো অথবা চা, এ সময়ে উপযোগী খাদ্য। যে সকল বালকদিগের রুক্ষ ধাতু, দুগ্ধাদির সঙ্গে তাঁহাদিগের এ সময় কিছু কিছু ফল খাওয়াও ভাল।

ইহার পর স্কুলে যাইবার এক ঘণ্টা—অন্ততঃ অর্দ্ধ ঘণ্টা পূর্ব্বে অন্নাহার। ভাত খাইবার পরে অন্ততঃ অর্দ্ধ ঘণ্টা বিশ্রাম আবশ্যক।

আবার, স্কুলে ২।৩ টার সময়, কিম্বা পাঠান্তে বাড়ী আসিয়া বালকগণ ফল, মিষ্টান্ন এবং ইহার সহিত কেহ দুগ্ধ, কেহ চা, কেহ কোকো, যাঁহার যাহা সুবিধা তাহা পান করিতে পারেন।

সন্ধ্যা বা রাত্রিতে শেষ আহার। এই সময় মাংস, রুটি, লুচি

খাইলেই ভাল। মাংস খাইবার যাঁহার সুবিধা নাই—তিনি রুটি, লুচি, মৎস্য, তরকারী, দুগ্ধাদি খাইতে পারেন।

যাঁহারা মাংস খান না, তাঁহাদের দুগ্ধ অপেক্ষাকৃত অধিক মাত্রায় পান করা আবশ্যক। কেন না দুধে সকল রকম দ্রব্যই আছে।

আহার করিবার সময় ভাল করিয়া চর্ব্বণ করিয়া খাইবার দিকে যেন বিশেষ লক্ষ্য থাকে।

চর্ব্বণের সহিত পরিপাকের বিশেষ ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ। শুনিতে পাওয়া যায় গ্ল্যাডষ্টোন প্রত্যেক মাংসের টুকরা গুণিয়া ৩২ বার এবং রুটির টুকরা ১৬ বার চর্ব্বণ করেন! স্বাস্থ্য রক্ষার ক্ষুদ্র নিয়মের প্রতিও তাঁহার এইরূপ দৃষ্টি আছে বলিয়াই এত বৃদ্ধ বয়সেও তিনি সুস্থ সবল আছেন। আহারের সময় সন্তুষ্ট চিত্তে আহার করিলে শীঘ্র পরিপাক হয়।

অতিরিক্ত ঝাল, টক, অথবা মসলামিশ্রিত ব্যঞ্জন অধিক খাওয়া উচিত নহে। অনিয়মিত সময়ে খাওয়াও স্বাস্থ্যহানি-কর,—তাহাতে বাজে জিনিষেই উদর পূর্ণ হইয়া যায়—নিয়মিত আহারের পক্ষে ব্যাঘাত জন্মে। আহারের পর কষ্ট হয়, এত অধিক করিয়া খাওয়াও স্বাস্থ্যের পক্ষে অমঙ্গলজনক। তাহাতে ক্রমে ক্ষুধা মন্দ হইয়া আসে ও পরিপাকের ব্যাঘাত ঘটে। আর একটী কথা—তৈল, ঘৃত, দুগ্ধ, মৎস্য, মাংস এ সকলই যাহাতে খাঁটি হয় তাহা দেখা উচিত।

সাধারণ আহারের নিয়ম আমরা সংক্ষেপে একরূপ বলিলাম, তবে কোন খাদ্য কাহারও ধাতুতে পরিত্যক্ত হইতে পারে। যেমন অম্ল প্রধান ব্যক্তির পক্ষে ডিম্ব প্রশস্ত আহার নহে।

সুতরাং কোন বিশেষ খাদ্য কাহার পক্ষে বিশেষরূপ ভাল বা মন্দ, তাহা প্রত্যেকেরই বাল্যকাল হইতে বুঝিতে চেষ্টা করা উচিত। যতক্ষণ না বুঝিতে পারা যায়, ততক্ষণ ডাক্তার ও প্রতিপালিকাদিগের উপদেশ লইয়া এ বিষয়ে কার্য্য করাই শ্রেয়ঃ।

ব্যায়াম।

আহারের দ্বারা আমাদের শরীরের ক্ষয় পূরণ হয়, ব্যায়াম আহার পরিপাকের সহায়তা করিয়া আহার গ্রহণের প্রকৃত ফল প্রদান করে। বস্তুতঃ আহার করিলেই হয় না, উত্তমরূপে আহার পরিপাক না হইলে তাহাতে ভাল ফল না হইয়া বরঞ্চ মন্দ ফলই ঘটে। সুতরাং নিয়মিত আহারের ন্যায় নিয়মিত ব্যায়ামও স্বাস্থ্যের পক্ষে অনুকূল। যে সকল বালকগণ সর্ব্বদাই দৌড়াদৌড়ি খেলাধূলা করিয়া বেড়ায়, তাহাদের আর অন্যরূপ ব্যায়াম চর্চ্চার আবশ্যক করে না—কিন্তু বিপরীত পক্ষে রীতিমত ব্যায়াম করা আবশ্যক। কোনরূপ ক্রীড়া দ্বারা এই ব্যায়াম কার্য্য সাধিত করিলে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক উপকার পাওয়া যায়। কেন না খেলায় শরীর সঞ্চালিত হইবার সঙ্গে সঙ্গে মনেরও স্ফূর্ত্তিলাভ হয়, এবং মুক্ত বায়ুতে ব্যায়াম করিলে ব্যায়ামের ফল আরও অধিক হয়। কিন্তু মুক্ত বায়ুতে পরিশ্রম করিতে হইলে সেই সময় অঙ্গে একটি ফ্লানেলের জামা ধারণ করা উচিত। পরিশ্রম করিতে করিতে শরীর ঘর্ম্মাক্ত হইলে ফ্লানেলে সেই ঘর্ম্ম শোষিত হইয়া যায়, সুতরাং ঘর্ম্মাক্ত শরীরে বাতাস লাগিলে যে অপকার হইবার কথা, ইহা দ্বারা তাহা নিবারিত হয়। আরও একটি কথা—ব্যায়ামের পর যদি অঙ্গ-বস্ত্র আর্দ্র থাকে, তবে তাহা ত্যাগ করিয়া শুষ্ক বস্ত্র পরিধান করা ভাল, কিন্তু তৎক্ষণাৎ গাত্রাবরণ খুলিয়া শূন্য গাত্রে

থাকা উচিত নহে; এবং কিয়ৎক্ষণ বিশ্রাম না করিয়া তখনি স্নান কিম্বা আহার করাও ভাল নহে।

ব্যাডমিন্টন, লনটেনিশ, ক্রিকেট বড় সুন্দর ব্যায়াম। পল্লি-গ্রামের ছেলেরা গ্রামের মাঠে সুবিধামত এই সকল খেলার স্থান করিয়া লইতে পারেন। আর সহরে যাঁহাদের বাড়ীতে উদ্যান আছে, তাঁহারা ত নিজের বাড়ীতেই ঐরূপ খেলার আড্ডা করিতে পারেন। এক এক পাড়ায় এইরূপ এক একটি স্থান থাকিলেই সেই পাড়ার সকল বালকগণই সেইখানে সমবেত হইয়া খেলায় যোগদান করিতে পারেন।

কিন্তু সকল দিন সকলের বাড়ীর বাহিরে গিয়া ব্যায়ামের সুবিধা না হইতে পারে, আর বর্ষাকালেও সকল দিন বাড়ীর বাহির হওয়া যায় না, সেই জন্য ঘরের মধ্যে থাকিয়া সহজে যে সকল ব্যায়াম করা যাইতে পারে, তাহাও দুই একটি আয়ত্ত করিয়া রাখা উচিত। মুদ্গর ও ডম্বলের সাহায্যে কিরূপে ব্যায়াম করিতে হয়, তাহা আমাদের দেশের বালক মাত্রেই প্রায় জানেন, কিন্তু লাঠি দ্বারা অতি সহজে যে কতকগুলি ব্যায়াম সম্পন্ন হইতে পারে, তাহা হয়তঃ অনেক বালকে জানেন না। তাহাও এক পক্ষে ব্যায়াম—অন্য পক্ষে প্রীতিজনক খেলা। আমেরিকার একজন এই ব্যায়াম সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছেন, তাহা "বালক" নামক মাসিক পত্র হইতে আমরা এইখানে উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি।

"ফিলাডেলফিয়ার যে স্কুলে আমি বিদ্যা শিক্ষা করিয়াছিলাম,

সেখানকার পড়িবার সমস্ত ঘর একই তলাতে, সমস্ত ঘরের মধ্যে এমন দেওয়াল দেওয়া যে ইচ্ছা করিলে সে সমস্ত দেওয়াল পাশের দিকে সরাইয়া দিয়া সকল ঘরগুলিকে একটা ঘরের মত করিয়া ফেলা যায়। হেড্‌মাষ্টার সঙ্কেত করিলেই, দিনের মধ্যে দুইবার, দুই প্রহরে ও বিকালে, ঘরের মধ্যকার দেওয়াল সরাইয়া দেওয়া হইত, বালকেরা অমনি দেওয়ালের কাছে গিয়া সেখানে যে সমস্ত লাঠি সাজান থাকিত, প্রত্যেকে তাহার এক এক গাছা হাতে করিয়া ঘরের মাঝখানে আসিয়া সার গাঁথিয়া দাঁড়াইত। এক জন শিক্ষক পিয়ানোর কাছে গিয়া একটা ছোট খাট সাদা সিদে স্বর বাজাইতেন, আর বালকেরা সেই তালেতালে লাঠি দিয়া ব্যায়াম করিত। দিনে দুইবার পাঁচ সাত মিনিট করিয়া এই প্রকার ব্যায়াম করিবার পর আমাদের এমন চমৎকার স্ফূর্ত্তি হইত, আমরা যেন নূতন বল পাইয়া আবার পড়িতে বসিতাম। অনেক দিন দুপর বেলার সময় কেমন ক্লান্তি বোধ হইত আর ঘুম পাইত, তখন এই প্রকার ব্যায়াম আমাদের জাগাইয়া দিয়া একেবারে তাজা করিয়া তুলিত। ইহাতে স্কুলের পড়ার কোন হানি না হইয়া বরং সম্পূর্ণ সহায়তা করিত। ঘণ্টা বাজিলে অমনি সকলে আপন আপন হস্তস্থিত লাঠিগুলি যথাস্থানে রাখিয়া নিজের নিজের পড়া আরম্ভ করিত, আবার এমনি সুনিয়মে কাজ চলিত যেন মাঝখানে কোন বাধাই পড়ে নাই।"

এই ব্যায়ামের সুবিধা এই যে, ইহা দ্বারা শরীরের গ্রন্থি ও মাংসপেশী সকলকে ইচ্ছামত সকল দিকে নোয়াইবার ও ফিরা-

ইবার ক্ষমতা বাড়ে, এই জন্য ইহা বালকদিগের পক্ষে বিশেষ উপযোগী। কাহারও যদি নত হইয়া চলিবার অভ্যাস থাকে কিম্বা বক্ষ সঙ্কীর্ণ থাকে, এই ব্যায়ামে তাহারও প্রতিকার হইতে পারে। ইহাতে বড় অধিক পরিশ্রম হয় না সুতরাং ইহা আরম্ভের পক্ষে ভাল। ব্যায়াম করিয়া বিশেষ ক্লান্ত হইয়া পড়িলে তাহাতে উপকার না হইয়া বরং অপকার হইবারই বেশী সম্ভাবনা। যে পরিমাণ শ্রমে শরীরে বেশ স্ফূর্ত্তি বোধ হয়, সেই পরিমণ শ্রমই স্বাস্থ্যকর।

লাঠির ব্যায়ামের নিয়ম এই—লাঠিগাছটি বেশ সোজা, চাঁচা ছোলা, আর এক ইঞ্চি আন্দাজ মোটা হওয়া চাই, ছোট ছোট ছেলেদের জন্য দুই হাত লম্বা, বড়দের জন্য আড়াই হাত।
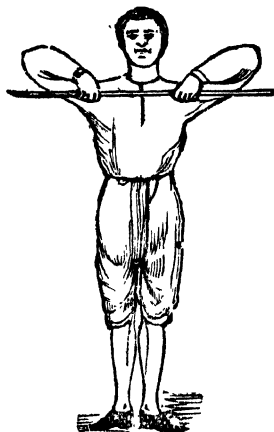
১ম চিত্র।

১। ১ম চিত্রে যেমন দেখিতেছ, ঐ রকমে দুই হাত দিয়া লাঠিগাছা তিন ভাগ করিয়া ধর। ঐ ভাবে হাত সবলে নীচে নামাইয়া পায়ের কাছাকাছি রাখ, আবার দাড়ির নিম্ন ভাগ পর্য্যন্ত উঠাও, হাতের কণুই যেন উপরের দিকে থাকে, ছবিতে যেমন দেখিতেছ।

২। ১ম চিত্রে যে রকমে লাঠি ধরা হইয়াছে, ঐ রকমে ধরিয়া যথাসাধ্য উচ্চে উঠাও, দশ বার এইরূপ করিবে।

৩। আগেকার মত লাঠি ধরিয়া যথাসাধ্য উচ্চে উঠাইয়া দ্বিতীয় চিত্রের ন্যায় ঘাড়ের নীচে নামাইয়া আন। এইরূপ দশ বার করিবে।

৪। আগেকার মত লাঠি ধরিয়া জোরে যথাসাধ্য উচ্চে উঠাইয়া নামাইবার সময় একবার ঘাড়ের নীচে নামাইবে, আর একবার দাড়ির নীচে নামাইবে।

২য় চিত্র।

৫। এবার ৩য় চিত্রে যেমন দেখিতেছ—লাঠির দুই ধার দুই হাতে ধরিয়া যথাসাধ্য উচ্চে উঠাও, পরে আবার ৪র্থ চিত্রে যেমন দেখিতেছ পিঠের দিকে যথাসাধ্য নীচে নামাও। দেখিও যেন হাত ঠিক সোজা থাকে, কণুই দোমড়াইয়া না যায়। এইরূপ কুড়িবার করিবে।

৬। আগেকার মত দুইধার দুই হাতে ধরিয়া লাঠি উচ্চে উঠাও, আর নামাইবার সময়ে একবার সম্মুখ দিকে, আর একবার পিঠের দিকে নামাও।

৭। লাঠির দুই ধার দুই হাতে ধরিয়া মাথার উপরে উঠাও, তার পরে ৫ম চিত্রে যেমন দেখিতেছ, ঐ রকমে একবার বাম দিকে আর একবার ডাইন দিকে ফিরাও। দেখিও যেন কণুই দোম্‌ড়াইয়া না যায়, আর লাঠি যেন খাড়া থাকে।
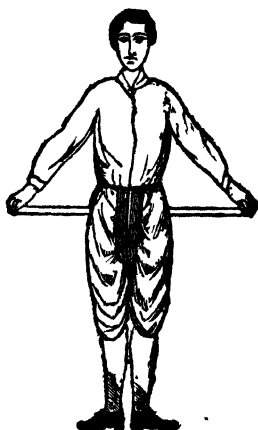
৩য় চিত্র।   ৪র্থ চিত্র

৮। লাঠির মাঝখানে পাঁচ ছয় ইঞ্চি দূরে, দুই হাত দিয়া ধরিয়া হাত যথাসাধ্য সোজা রাখিয়া সম্মুখের দিকে বাড়াইয়া দেও; তার পরে হাত আড়ষ্ট করিয়া রাখিয়া যতদূর সম্ভব এক পাশ হইতে আর একপাশে ঘুরাও।

৫ম চিত্র

৯। ডানহাতে লাঠির মাথা ধরিয়া, দুই পায়ের দুই গোড়ালি একত্র করিয়া সোজা হইয়া দাঁড়াও। দাঁড়াইয়া যতদূরে পার তেড়াভাবে লাঠি বাড়াইয়া দেও, লাঠির অগ্রভাগ যেন ভূমি স্পর্শ করে এবং লাঠি ও শরীর দুইই যেন ঠিক খাড়া থাকে। তার পরে ৬ষ্ঠ চিত্রে যেমন দেখিতেছ ঐ ভাবে পা বাড়াইয়া দেও, পা লাঠির পশ্চাৎ দিকে পড়িবে। এইরূপ করিবার সময়ে কণুই যেন দোমড়াইয়া না যায়, আর লাঠি যেন না নড়ে। ইহাতে কাঁধও প্রায় নড়ে না, কেবল পায়ের দিকটা নড়ে চড়ে—এই রকম ভাবে একবার ডান পা বাড়াইবে, আর একবার বাঁ পা বাড়াইবে। দশবার এইরূপ করিবে।

১০। সোজা হইয়া দাঁড়াও; ৭ম চিত্রের ন্যায় লাঠির মাথা বাঁ হাতে ধরিয়া তেড়াভাবে ডান দিকে যতদূরে পার ডান পা বাড়াইয়া দেও, তার পরে লাঠির দিকে বাঁ পা বাড়াইয়া দেও। বাঁ পা ঠিক ঐ অবস্থায় রাখিয়া ডান্ পা একবার যতদূরে সাধ্য বাড়াইয়া দিবে—আবার টানিয়া লইবে। ঐরূপ করিবার সময় ডান পায়ের হাঁটু যেন দোম্ড়াইয়া না যায়, আর মাথা ও কাঁধের ঝোঁক যেন পশ্চাৎ দিকে থাকে।

১১। ৮ম চিত্রে যেমন দেখিতেছ, ঐ প্রকারে লাঠি ধরিয়া দুই হাত সোজা ভাবে সম্মুখ দিকে উঠাও, আবার বুকের দিকে টানিয়া লও। লাঠি যেন সর্ব্বক্ষণ ঠিক খাড়া থাকে। দশ বার এইরূপ করিবে।
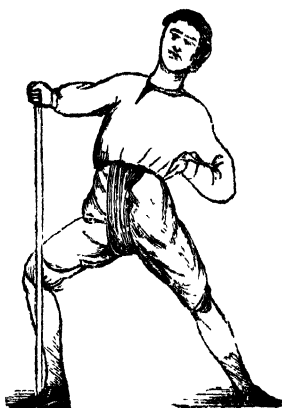
৬ষ্ঠ চিত্র।

১২। শেষোক্ত প্রকার ব্যায়ামের মত সম্মুখে হাত উঠাইয়া ৯ম চিত্রের ন্যায় লাঠি দক্ষিণ হস্তে রাখ, আবার সম্মুখ দিকে হাত উঠাইয়া উক্তরূপে লাঠি বাম হস্তে ধর। দশবার এইরূপ করিবে।

১৩। পূর্ব্বোক্ত প্রকারে সম্মুখের দিকে হাত উঠাইয়া ৮ম চিত্রের ভাবে লাঠি বুকের কাছে ধর। তারপরে ১০ম চিত্রে যেমন দেখিতেছ, ঐরূপে একবার তেড়াভাবে লাঠি বাঁ দিকে উচে উঠাও—আবার বুকের কাছে ধরিয়া তেড়াভাবে ডান দিকে বাড়াইয়া দেও। এইরূপে লাঠি এক-বার এপাশে—একবার ওপাশে কুড়িবার ধর।
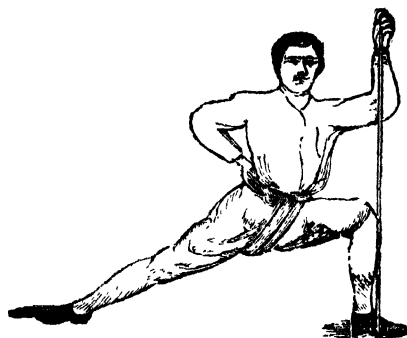
১৪। শেষোক্ত ব্যায়ামের মত লাঠি ডানদিকে বাড়াইবে ও সেই সঙ্গে ডান পাও সেই দিকে বাড়াইবে। ১১শ চিত্রের ন্যায় পা

৭ম চিত্র।

ও লাঠি দুইই তেড়া-ভাবে একবার বাঁ দিকে, একবার ডান দিকে বাড়াইবে। এই-রূপ কুড়িবার করিবে।

১৫। শেষোক্ত প্রকারে লাঠি যখন বাঁ দিকে বাড়াইবে, তখন সেই সঙ্গে ডান পা ডানদিকে বাড়াইবে। আবার লাঠি যখন ডানদিকে বাড়াইবে, তখন সেই সঙ্গে বাঁ পা বাঁ দিকে বাড়াইবে।

৮ম চিত্র।

১৬। ডান্ পা তেড়াভাবে সম্মুখ দিকে বাড়াইবে, আর সেই সঙ্গে লাঠি তেড়াভাবে বাঁ কাঁধের উপর দিয়া পিঠের দিকে বাড়াইবে, আবার বাঁ-পা ঐ ভাবে বাড়াইবে ও সেই সঙ্গে লাঠি ডান কাঁধের উপর দিয়া বাড়াইবে।

১৭। ডান পা তেড়াভাবে পশ্চাৎ দিকে বাড়াইবে, আর সেই সঙ্গে লাঠি তেড়াভাবে সম্মুখ দিকে বাঁয়ে বাড়াইবে, ১২শ চিত্রে যেমন দেখিতেছ। বাঁ পা যখন পশ্চাৎ দিকে বাড়াইবে, তখন লাঠি সম্মুখ দিকে বাড়াইবে।

১৮। ডান পা তেড়াভাবে পশ্চাৎ দিকে বাড়াইবে, আর সেই সঙ্গে লাঠি তেড়াভাবে পশ্চাৎ দিকে ডাইনে বাড়াইবে। আবার বাঁ পা তেড়াভাবে পশ্চাৎ দিকে বাড়াইবে, আর সেই সঙ্গে লাঠি তেড়াভাবে পশ্চাৎ দিকে বাড়াইবে।

১৯। শেষোক্ত ভাবে পা ও লাঠি বাড়াইবে, কেবল যখন ডান পা বাড়াইবে, তখন লাঠি বাঁয়ে, আর যখন বাঁ পা বাড়াইবে তখন লাঠি ডাইনে বাড়াইবে।

এই ব্যায়াম সকল তালে তালে করিলে বড় ভাল হয়। বালকেরা এক গাছা লাঠি অনায়াসেই সংগ্রহ করিতে পারেন, সুতরাং উল্লিখিতরূপ ব্যায়াম অভ্যাস করা বালকদিগের পক্ষে যেমন সহজ-সাধ্য, তেমনি সুবিধাজনক।

৯ম চিত্র

১০ম চিত্র।

১১ চিত্র।

১২শ চিত্র।

সন্ধ্যা।

সুনীরব সন্ধ্যাকালে পূরব গগন-ভালে
জ্বল জ্বল তারা দুটি চাহে হেসে হেসে।
বায়ু বহে মৃদু মন্দ, মধুর চাঁপার গন্ধ
পাতার বিতান হতে আসে ভেসে ভেসে।

নিভৃত নিকুঞ্জ বাটী, বসে আছি একেলাটি,
নয়নে আঁধার জাগে স্নিগ্ধ অভিরাম!
নভপটে ছায়া ছায়া স্পর্শ হীন তরু-কায়া
ধেয়ায় একাগ্র-চিতে কি রহস্য নাম।

বকুল শাখাটি নুয়ে দুলে দুলে মাথা ছুঁয়ে
দু একটি ফেলে কোলে ফুল টুপ টাপ,
প্রশান্ত সরসী তলে ঘনাইছে ছায়া দলে;
গভীর প্রাণেতে তার কি যেন বিলাপ।

মালতীর লতা গাছে ফুলে ফুলে ভরিয়াছে,
আঁধারে রূপের আলো চমকে নয়ান;
সুদূরে মন্দির মাঝে পুরবী রাগিণী বাজে
তুলিয়া প্রাণের প্রাণে অনন্তের তান।

—:•:—

কৃতজ্ঞতা।

ধন্যাস্ত্ব কস্যচিল্লোকে হৃদয়ং তদলঙ্কৃতম্।
বিরাজতে সদা যত্র মহারত্নং কৃতজ্ঞতা॥

এই পৃথিবীতে তিনিই ধন্য, তাঁহার হৃদয়ই অলঙ্কৃত যাঁহার হৃদয়ে মহারত্ন কৃতজ্ঞতা সতত বিরাজিত।

কেহ উপকার করিলে সেই উপকার অনুভব করিয়া উপকারক ব্যক্তির প্রতি হৃদয়ে যে সদ্ভাব ও অনুরাগের উদ্রেক হয়, তাহাই কৃতজ্ঞতা।

উপকার পাইয়া যে ব্যক্তি কৃতজ্ঞ না হয়, সে নিতান্তই নীচ প্রকৃতির লোক। আমাদের শাস্ত্রে কৃতঘ্নতা সকল পাপের অপেক্ষা মহত্তর পাপ বলিয়া গণিত। নিম্নলিখিত গল্পে কৃতজ্ঞতার একটি আদর্শ দৃষ্টান্ত দেখিতে পাওয়া যায়।

নেপোলিয়নের মাতা একদা নেপোলিয়ন ও তাঁহার ভগিনী ইলিজা এই দুই জনকে প্রজাপতি ধরিবার একটি জাল দিয়া বাড়ীর বাগানের মধ্যে তাঁহাদিগকে খেলিতে অনুমতি প্রদান করেন, কিন্তু বাগানের বেড়ার বাহিরে যাইতে নিষেধ করেন।

তাঁহারা জাল পাইয়া মহানন্দে বাগানে খেলা করিতেছেন—এমন সময়ে একটি ক্ষুদ্র প্রজাপতির প্রতি তাঁহাদের দৃষ্টি পড়িল, অমনি তাঁহারা অন্য খেলা ফেলিয়া সেইটি ধরিতে ছুটিলেন। প্রজাপতি বাগানের বাহিরে গেল। মাতার নিষেধ

ভুলিয়া নেপোলিয়নও তৎক্ষণাৎ লাফাইয়া বেড়া অতিক্রম করিলেন, এবং ইলিজ্বাকেও ধরিয়া বেড়ার বাহিরে নামাইয়া দিলেন। মনের উচ্ছ্বাসে ছুটিতে ছুটিতে ইলিজ্বা একটি ডিম্ব-বিক্রেত্রী বালিকার উপর আসিয়া পড়িলেন। ইহাতে বালিকার মস্তক হইতে ডিমের ঝুড়িটি ভূমিতলে পড়িয়া গিয়া তাহার সমস্ত ডিম্বগুলিই প্রায় ভাঙ্গিয়া নষ্ট হইয়া গেল। বালিকা কাঁদিতে লাগিল।

ইলিজ্বা তাহাতে ভীত হইয়া নেপোলিয়নকে বলিলেন "চল ভাই আমরা পালাই। এ মেয়েটি আমাদের চেনে না, চেনা লোক কেহ দেখিবার আগে আমরা বাড়ী পৌছিতে পারিব।"

নেপোলিয়ন বলিলেন "না আমি পলাইব না। দেখিতেছ না মেয়েটি কাঁদিতেছে? আমরা উহার ক্ষতি করিয়াছি—যতদূর পারি এখন তাহা পূরণ করিতে আমাদের চেষ্টা করা উচিত।"

ইলিজ্বা একটু লজ্জিত হইয়া পড়িলেন,—কারণ ক্ষতি তিনিই করিয়াছেন, অথচ তিনিই নিজে পলাইতে চাহিতেছেন।

এদিকে মেয়েটী অত্যন্ত কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল—"এই ডিম বিক্রয় করিয়া যাহা কিছু পাওয়া যাইত, তাহাতে আমাদিগের পরিবারের তিন দিন আহার চলিত। এখন আমি কি করিয়া আমার শয্যাগতা মাতা এবং ক্ষুধিত ভ্রাতা ভগিনীদিগের নিকট গিয়া বলিব যে তিন দিন আর তাহারা আহার পাইবে না?"

এই কথা শুনিয়া নেপোলিয়ন তাঁহার পকেট হইতে ২টী ফ্রিন লইয়া তাহাকে দিয়া বলিলেন, "আমাদের যাহা সাধ্য দিতেছি, তুমি আর কাঁদিও না।"

তাঁহাদিগের দৈনিক জলখাবার কিনিবার এই ফ্রিন দুইটী নেপোলিয়ন বালিকাকে দান করিলেন দেখিয়া ইলিজা ব্যগ্র ভাবে বলিয়া উঠিলেন "ভাই, ও কি করিলে? আমরা যে শুধু রুটী ছাড়া আজ আর কিছুই খাইতে পাইব না।"

নেপোলিয়ন বলিলেন "তা কি করিব? আমাদের দোষে উহারা কেন কষ্ট পাইবে?"

এইরূপ কথোপকথন চলিতেছে, এমন সময় একজন দাসী আসিয়া বলিল নেপোলিয়নের মাতা তাঁহাদিগকে ডাকিতেছেন। নেপোলিয়ন সেই গরীব বালিকাকে আপনাদিগের অনুসরণ করিতে বলিয়া দাসীর সঙ্গে বাড়ী ফিরিয়া গেলেন। তাঁহার মাতা তাঁহাদিগকে ভৎসনা করিয়া কহিলেন "আমি তোমাদিগকে বেড়ার অপর পারে যাইতে বারণ করিয়াছিলাম—তোমরা আমার কথা রাখ নাই, ঐ জাল আর তোমরা পাইবে না, আমাকে ফিরাইয়া দাও।" নেপোলিয়ন এই কথা শুনিয়া বলিলেন "মা ইলিজার কোন দোষ নাই, আমিই প্রথমে বেড়ার ওদিকে যাইয়া উহাকে নামাইয়া লইয়াছিলাম।" নিজের দোষ কাটিয়া গেল দেখিয়া ইলিজা প্রফুল্ল নয়নে ভ্রাতার দিকে চাহিল। ইলিজার মাতুলও এই ঘরে ছিলেন, তিনি নেপোলিয়নকে এইরূপ দোষ স্বীকার করিতে দেখিয়া সন্তুষ্ট হইয়া নেপোলিয়নের মাতাকে

বলিলেন, "নেপোলিয়ন নিজের দোষ স্বীকার করিয়াছে অতএব আমার অনুরোধে উহাকে ক্ষমা কর।" ভ্রাতার অনুরোধে নেপোলিয়নের মা তাঁহাকে ক্ষমা করিলেন। ইলিজা তখন অশ্রুপূর্ণ নেত্রে মাতুলকে বলিলেন "মামা তুমি কি আমার হইয়া মাকে একটু বলিবে না? আমি যে নেপোলিয়ন অপেক্ষাও বেশী দোষ করিয়াছি।" মাতুল বলিলেন "তোমার দোষ কি আগে বল—পরে বিচার করিব।" ইলিজা তখন ডিম ভাঙ্গা হইতে আরম্ভ করিয়া সমস্ত ঘটনাই বলিয়া গেল। বলা বাহুল্য যে ইলিজাও ক্ষমা প্রাপ্ত হইল। তখন নেপোলিয়ন তাঁহার মাকে বলিলেন 'মা, তুমি যদি আমাকে দুইটী ফ্রাঙ্ক ধার দাও তবে আমি এখন এই বালিকাকে তাহার ডিমের মূল্য দিতে পারি।"

মা বলিলেন "কিন্তু বুঝিয়া দেখ, তাহা হইলে তুমি আর চারি মাসের মধ্যে কিছুই পাইবে না।" নেপোলিয়ন তাহাতেও সম্মত হইয়া ফ্রাঙ্ক দুইটী লইয়া বালিকাকে দিলেন। বালিকা সন্তুষ্ট হইল এবং পূর্ব্ব প্রদত্ত ফ্লরিন দুইটী ফিরাইয়া দিতে চাহিল। বালিকার এইরূপ সদ্ব্যবহার দেখিয়া নেপোলিয়নের মাতা সন্তুষ্ট হইলেন, এবং নেপোলিয়নের অনুরোধে তাহাদিগকে সাহায্য করিবার ইচ্ছায় নেপোলিয়ন ও ইলিজাকে সঙ্গে লইয়া বালিকার অনুবর্ত্তী হইলেন। তাহাদের বাড়ী গিয়া দেখিলেন বালিকার মা শয্যাগত এবং পাশে কয়েকটী শিশু কাঁদিতেছে; ইলিজা ও তাঁহার মা যাইয়া তাহাদের শুশ্রূষা করিতে বসিলেন, এবং একটী বড়

বালককে কিছু দূরে বসিয়া কাজ করিতে দেখিয়া নেপোলিয়ন তাহারই সহিত বসিয়া কথা কহিতে আরম্ভ করিলেন।

এই বালকের নাম জ্যাকোপা। ক্রমে ক্রমে নেপোলিয়নের সহিত এই বালকটীর বিলক্ষণ ভাব হইল। নেপোলিয়ন সর্ব্বদাই তাহাদের বাড়ী যাইতেন ও সাধ্যমত তাহাদের সাহায্য করিতেন। জ্যাকোপাও তাহার বন্ধুকে প্রাণের সহিত ভালবাসিত ও দেবতার ন্যায় ভক্তি করিত। হায়! তাহাদের এ বন্ধুতার সুখ বেশী দিন রহিল না। দশম বৎসরে পড়িবামাত্রই নেপোলিয়ন জন্মের মত কর্সিকা পরিত্যাগ করিয়া গেলেন, কাজেই তাঁহার বাল্যসখার নিকট বিদায় লইতে হইল। যাইবার সময় নেপোলিয়ন জ্যাকোপাকে স্বনামখোদিত একটী ক্ষুদ্র বাক্স উপহার দিয়া গেলেন। জ্যাকোপা তাহা অতি আদরের সহিত গ্রহণ করিল এবং প্রতিজ্ঞা করিল জীবন থাকিতে এ বাক্স সে কখনই কাছছাড়া করিবে না।

* * *

এই ঘটনার পর আজ অনেক বৎসর চলিয়া গিয়াছে। যে বালকের আগে একটী ফ্লোরিন মাত্র মাসিক আয় ছিল, আজ তিনি রাজ-রাজেশ্বর—আজ তিনি ফ্রান্সের সম্রাট, দুর্গম আল্প পর্য্যন্তও এখন তাঁহার গতিরোধে সমর্থ নহে, সমস্ত ইয়ুরোপ আজ তাঁহার নামে কম্পিত।

কিন্তু এখনও তাঁহার জয়ের আশা মিটে নাই। ঐ দেখ জয়াশায় এখনও তিনি যুদ্ধে ব্যস্ত। অশ্বের হ্রেষা রবে, কামানের

গভীর গর্জ্জনে, ধূমে, রণবাদ্যে, আহতদিগের চীৎকারে রণস্থল এক ভীষণ মূর্ত্তি ধারণ করিয়াছে, কিন্তু জয়লক্ষ্মীকে আলিঙ্গন করিতে নেপোলিয়ন কোথায় না অগ্রসর হইতে পারেন ? হায় ! এইবার বুঝি জয়লক্ষ্মীর পরিবর্ত্তে তাঁহার মৃত্যুকে আলিঙ্গন করিতে হয় ! ঐ দেখ একজন শত্রুসেনা নেপোলিয়নের উপর অস্ত্র তুলিয়াছে—এমন সময়ে একজন ফরাসী সৈনিক নক্ষত্রবেগে ছুটিয়া আসিয়া নেপোলিয়নের স্থল অধিকার করিয়া তাঁহার প্রাণরক্ষা করিল বটে কিন্তু সে নিজে আহত হইল। এ সৈনিক আর কেহই নহে—তাঁহারই বাল্যসখা জাকোপা। জাকোপা তাহার বন্ধুকে এত ভালবাসিত যে, তাহার সঙ্গে থাকিবার জন্য সেও দেশ পরিত্যাগ করিয়া এখানে আসিয়া তাঁহার কোন সেনাপতির অধীনে কার্য্য গ্রহণ করে। তখন নেপোলিয়ন রাজরাজেশ্বর, জাকোপা সামান্য সৈনিক মাত্র, পরস্পরের দেখা শুনা হইবার কোন সম্ভাবনা নাই। তথাপি বন্ধুর কাছে আছি এই ভাবিয়াই সে সুখী হইত। পরন্তু এই ঘটনার পর হইতে তাঁহাদের পুরাতন বন্ধুতা আবার জাগিয়া উঠিল। জাকোপা জয়ে, পরাজয়ে, সুখে, দুঃখে, বিপদে, সম্পদে ছায়ার ন্যায় প্রভুর অনুসরণ করিত। যখন তাঁহার আর কেহই ছিল না, তখনও জাকোপা ছিল। এই যুদ্ধের কয়েক বৎসর পরেই প্রসিদ্ধ ওয়াটারলুর যুদ্ধে বন্দী হইয়া নেপোলিয়ন সেণ্ট হেলেনায় প্রেরিত হ'ন। তিনি যত দিন সমুদ্রে জাহাজে ছিলেন, জাকোপা তাঁহার উদ্ধার সাধনের জন্য অনেক চেষ্টা করিয়াছিল, অবশেষে হতাশ হইয়া তাঁহার সহিত কারা-

বাসের প্রার্থনা করে। নেপোলিয়ন শৈশবে জ্যাকোপার উপকার করিয়াছিলেন—সে উপকার জ্যাকোপা জীবনে ভোলে নাই। যখন নেপোলিয়ন সেন্ট হেলেনায় একাকী আবদ্ধ ছিলেন, তখন জ্যাকোপা ভিন্ন তাঁহার সঙ্গে আর কেহই ছিল না। প্রভুভক্ত জ্যাকোপা মরণ পর্য্যন্তও তাঁহার সঙ্গে রহিল এবং তাঁহার মৃত্যুর পর তাঁহার যাহা কিছু অবশিষ্ট ছিল, তাহা লইয়া ফ্রান্সে প্রত্যাগমন করিল। এই জন্য এখন পর্য্যন্ত ফ্রান্সের রাজধানী পারিসে জ্যাকোপার প্রস্তর-নির্ম্মিত প্রতিমূর্ত্তি বিদ্যমান আছে!

এ পৃথিবীতে কিছুই বৃথা যায় না। নেপোলিয়নের জীবন নিষ্ঠুর কার্য্যে অতিবাহিত থাকুক আর নাই থাকুক, আমাদিগের এখানে সে কথার আবশ্যক নাই কিন্তু শৈশবে তিনি যে ভাল কাজ [illegible]

[illegible]

[illegible]

———:•:———

আশা।

অস্তমিত চন্দ্র তনু কম্পিত তমস-অণু,
স্তব্ধ ঘোরা দ্বিপ্রহরা নিশি,
নির্ম্মল অম্বর তলে সহস্র তারকা জ্বলে
নিদ্রায় আকুলা দশদিশি।
বায়ু বহে ধীরে ধীরে, আঁধার সরসী তীরে
গাছ পালা কাঁপে মুহুর্মুহু !
চক্রবাক চক্রবাকী সাড়া দেয় থাকি থাকি ;
ঘুম ঘোরে পিক ডাকে কুহু।
খদ্যোতিকা দলে দলে, এই নিভে এই জ্বলে,
স্বপনেতে যেন কাঁদে হাসে।
কুটীরে মাটীর দীপ, করিতেছে টিপ টিপ,
শিশু শুয়ে জননীর পাশে।
পুটে পুটে দাঁত দুটি হাসিতে রয়েছে ফুটি
কচি অধরের মাঝখানে।
ভাঙ্গা জানালাটি দিয়ে. বৃহস্পতি আছে চেয়ে
বিমল সে মধু মুখ পানে।
থাক' শিশু ঘুমাইয়া, এই পুণ্য প্রাণ দিয়া
যৌবনে উঠিও জাগি তুমি ;—
আশীর্ব্বাদ পূর্ণ হবে, সবে ধন্য ধন্য কবে,
পবিত্র হইবে মাতৃ ভুমি।

——:০:——

সমাপ্ত।

'গল্পস্বল্পে' স্বাস্থ্য সম্বন্ধে যাহা লেখা হইয়াছে, ক্যাম্বেল মেডি-ক্যাল স্কুলের অধ্যাপক ডাক্তার শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ রায় এবং ডাক্তার শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় তাহা পড়িয়া বালক বালিকাদিগের পাঠোপযোগী এবং বিজ্ঞান-সঙ্গত বলিয়াছেন' ইহাঁদের এ সম্বন্ধীয় পত্র দুইখানি নিম্নে উদ্ধৃত করিয়া দিলাম।

দেবেন্দ্র বাবুর পত্র।

"স্বাস্থ্য সম্বন্ধে আপনি যে প্রবন্ধটি লিখিয়াছেন, তাহা অতি সুললিত প্রাঞ্জল ভাষায় লেখা হইয়াছে, আর তাহাতে যে বিষয়-গুলি বিবৃত হইয়াছে, তাহা আধুনিক 'হাইজিন' শাস্ত্রের সম্পূর্ণ অনুমোদিত।"

ব্রজেন্দ্র বাবুর পত্র।

"আমি আপনার পুস্তকের প্রুফ পাঠ করিয়া কোন পরিব[illegible] [illegible] আবশ্যক বিবেচনা করি না। আপনার ভা[illegible]

[illegible]

সংশো: ইত্যাদি

আমরা কৃতজ্ঞ হৃদয়ে স্বীকার করিতেছি যে, বেথুন স্কুলের সংস্কৃত অধ্যাপক পণ্ডিত শ্রীযুক্ত চন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য্য প্র[illegible] সংস্করণকালে এবং শ্রীযুক্ত চন্দ্রনাথ বসু দ্বিতীয় সংস্করণকালে এই পুস্তকের ভাষা সংশোধন করিয়া যথেষ্ট উপকার করিয়াছেন।

এই পুস্তকের দ্বিতীয়, সপ্তম ও অষ্টম এই তিনটি গল্প শ্রীমতী হিরণ্ময়ী দেবীর লেখা।